কিতাবুল হজ্জ

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

হযরত মুফতী সাহেব হুযুর দামাত বারাকাতুহুম ২৫ বছরেরও অধিককাল ধরে বাইতুল্লাহর মুসাফিরদেরকে হাতে-কলমে হজ্জ প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। আলেম, তালিবে ইলমসহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সীমাহীন উপকৃত হচ্ছেন। প্রশিক্ষণার্থী এবং অন্যান্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তা কিতাবুল হজ্জ নামে গ্রন্থ আকারেও প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ বছর যারা বাইতুল্লাহর মুসাফির হওয়ার এরাদা করেছেন তাদের খিদমতে সামান্য সংক্ষেপনপূর্বক গ্রন্থটি রাবেতায় মুদ্রিত হল। আমাদের বিশ্বাস, এটি অধ্যয়ন করলে এবং হজ্জের পবিত্র সফরে সঙ্গে রাখলে হুজ্জাজে কেরাম হজ্জ-কার্যক্রমের প্রায় সকল ক্ষেত্রে একজন বিদগ্ধ মুফতীর কোমল সান্নিধ্য অনুভব করবেন। –সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর বিশেষ নৈকট্য দান করার জন্য পৃথিবীতে অবস্থিত বাইতুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘরে নিয়ে যান। আল্লাহ তা'আলার ঘরের অর্থ হল এই ঘর আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত।

তিনি স্বীয় বাছাইকৃত বান্দাদেরকে নিজের আশেক-দেওয়ানা বানানোর জন্য হজ্জের নামে আপন ঘরের তাওয়াফের জন্য নিয়ে যান। তাই হজ্জের লেবাসও অনেকটা পাগলের লেবাসের মত রাখা হয়েছে। মাথা খোলা, পেট খোলা, পায়ে নিতান্ত সাধারণ স্যান্ডেল, এলোমেলো চুল, সাজগোজের কোনো বালাই নেই– অনেকটা পাগলের বেশই বলা চলে। কিছু লোক তো বাস্তবেই আল্লাহ তা'আলার পাগল হয়ে সেখানে যান, আর কিছু লোক পাগল না হলেও পাগলের বেশ ধরার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাস্তব আল্লাহ প্রেমিকদের দলভুক্ত করে নেন। ধানের সঙ্গে যেমন চিটা বিক্রি হয়, চালের সঙ্গে যেমন পাথর বিকে যায়, তেমনই আসল প্রেমিকদের সঙ্গে নকল প্রেমিকরাও কবূল হয়ে যায়।

হজ্জ কাকে বলে: আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত-প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে ইহরাম বাঁধার পর পবিত্র মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে বিশেষ কিছু কাজ করাকে হজ্জ বলা হয়। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৬ রশীদিয়া)

হজ্জের নিয়ত খাঁটি হওয়া জরুরী: হজ্জে যাওয়ার সময় নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিবে। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্জ করছি এমন নিয়ত করবে। লোকে হাজী বলবে, সম্মান দেখাবে, প্রসিদ্ধি অর্জন হবে, ব্যবসা ভালো জমবে, ইলেকশনে ভালো করা যাবে, এ ধরণের মনোভাব নিয়ে হজ্জ করলে সাওয়াব তো হবেই না; উল্টো রিয়ার কারণে গুনাহ হবে। রিয়া বা লোক দেখানো প্রবণতা এমন ভয়ানক গুনাহ যে, এই একটি গুনাহের কারণেই বড় বড় আলেম, শহীদ ও দানবীরগণ জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। রিয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজের হজ্জের ঘটনা ঘটা করে অন্যের কাছে না বলা উচিত। তবে কেউ জিজ্ঞেস করলে মাসআলার আলোচনা হিসাবে বলতে দোষ নেই। (সহীহ মুসলিম হা.নং ১৯০৫)

হজ্জের সফরের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি: ১. পাসপোর্ট তৈরি করা ২. সরকার অনুমোদিত বিশ্বস্ত কোনো হজ্জ এজেন্সি বা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে ভিসা, বিমানের টিকেট এবং রিয়াল বা ডলার সংগ্রহ করা।

কার উপর হজ্জ ফরয: যার মালিকানায় নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচের অতিরিক্ত এই পরিমাণ টাকা-পয়সা বা সম্পত্তি আছে, যা দ্বারা হজ্জে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্জকালীন নিজের ও সাংসারিক খরচ নির্বাহ হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ফরয। (আদ্দুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার ২/৪৫৮)

* হজ্জ যে বছর ফরয হয় সে বছরই তা আদায় করা ওয়াজিব। গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর ছাড়া হজ্জ বিলম্বিত করলে গুনাহ হবে। তবে পরবর্তীতে হজ্জ আদায় করে নিলে এই গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু হায়াতের বা সুস্থতার গ্যারান্টি কোথায়? (রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৭ রশীদিয়া, কিতাবুল মাসাইল ৩/৭৬)

মহিলাদের হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত: প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই পরিমাণ টাকা-পয়সা বা জমিজমা থাকা যা দিয়ে নিজের এবং একজন মাহরামের হজ্জে যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন সম্ভব হয়। কোনো মহিলার যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু সাথে যাওয়ার মতো কোনো মাহরাম নেই। তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কোনো মহিলার মাহরাম হজ্জে যাচ্ছে সে-ও তার সাথে হজ্জে চলে গেল, এক্ষেত্রে সে তার মাহরামকে কোনো খরচ না দিলেও তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৬৪)

* যদি কারো স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়, আর সে হজ্জে যাওয়ার জন্য কোনো মাহরামও পেয়ে যায় (যেমন ছেলে, পিতা, চাচা, ভাই, মামা, এদের মধ্য থেকে কাউকে) তাহলে স্বামী তাকে হজ্জে যেতে নিষেধ করতে পারবে না। তবে নফল হজ্জের ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীকে যে কোনো মাহরামের সাথে যেতে নিষেধ করতে পারবে। আর স্ত্রীও উক্ত নিষেধাজ্ঞা মানতে বাধ্য থাকবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৬৫)

মাহরাম কারা?: যাদের সাথে কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হয় না তারাই মাহরাম। যেমন: পিতা,পুত্র, আপন ও সৎ ভাই, দাদা-নানা, আপন চাচা ও মামা, ছেলে বা মেয়ের ঘরের নাতি এবং তাদের ছেলে, জামাতা, শ্বশুর, দুধ ভাই, দুধ ছেলে ইত্যাদি। তবে একা একা দুধ ভাইয়ের সাথে যাওয়া এবং যুবতী শাশুরীর জামাতার সাথে যাওয়া নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৪)

* মুতাআখখিরীন উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া হলো, বর্তমান ফেতনার যামানায় শুধুমাত্র নিজের খান্দানের দীনদার মাহরামের সাথে হজ্জে যাবে। অন্যান্য মাহরামের সাথে যাবে না। (ইসলাহুল খাওয়াতীন)

মাহরাম এর বয়স: মাহরামের জন্য সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া এবং বালেগ হওয়া শর্ত। তবে অনেক ফকীহ এর মতে মাহরাম যদি মুরাহিক অর্থাৎ বালেগ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তাহলে তাকে নিয়েও সফরে যাওয়া জায়েয আছে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩১-৩২)

* বৃদ্ধ মহিলাও মাহরাম ছাড়া অন্যান্য মাহরামওয়ালা মহিলার সাথে হজ্জে যেতে পারবে না। (মুসলিম শরীফ হা.নং ১৩৩৮, মানাসিক পৃ. ৫৬)

* কোনো মহিলার মাহরাম না থাকলে ফরয হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিবাহ করা

তার জন্য জরুরী নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৪)

মাহরাম না থাকলে করণীয়: কোনো মহিলার নিকট মাহরাম নিয়ে হজ্জে যাওয়ার টাকা আছে, কিন্তু সে কোনো মাহরাম পাচ্ছে না যে তাকে হজ্জে নিয়ে যাবে, তাহলে সে শারীরিকভাবে হজ্জ আদায়ের সক্ষমতা থাকা পর্যন্ত মাহরামের অপেক্ষা করবে। যখন শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে যাবে তখন কারো মাধ্যমে বদলী হজ্জ করাবে। এছাড়া হজ্জ করতে না পারার ক্ষেত্রে বদলী হজ্জের ওছিয়ত করে রাখাও ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ২/৫৯৯)

মাহরাম ছাড়াই হজ্জ : যদি কোনো মহিলা স্বামী বা মাহরাম ছাড়াই ফরয হজ্জ আদায় করে ফেলে, তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে বটে কিন্তু সে গুনাহগার হবে। এ গুনাহের জন্য তাওবা-ইস্তিগফার করে নেয়া জরুরী। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৫)

মাহরাম সৌদিআরব থাকলে: যদি কোনো মহিলার স্বামী বা মাহরাম সৌদিআরব থাকে, আর সে তাকে নিয়ে হজ্জ করতে চায়, তথাপি তার জন্য মাহরাম ছাড়া বাংলাদেশ থেকে সফরে বের হওয়া জায়েয হবে না। (ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২২১)

ইদ্দত অবস্থায় থাকলে: যদি কোনো মহিলা স্বামীর মৃত্যুর কারণে বা তালাকের কারণে ইদ্দত অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নেই। তথাপি কেউ যদি এই অবস্থায় গিয়ে হজ্জ করে ফেলে, তাহলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইদ্দত অবস্থায় সফর করার কারণে তার কবীরা গুনাহ হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৫)

হালাল টাকা হজ্জ কবুলের শর্ত: হজ্জের জন্য যে অর্থ খরচ করা হবে তা হালাল হতে হবে। হজ্জের মধ্যে হারাম টাকা খরচ করা হারাম। যে হজ্জে হারাম টাকা খরচ হয়, সে হজ্জ কবুল হয় না। কারো কাছে হালাল টাকা নেই কিন্তু সে হজ্জ করতে চায়, তাহলে সে কারো কাছ থেকে হালাল পন্থায় উপার্জিত টাকা ঋণ নিবে। এরপর হালাল টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করবে। একান্ত কোনো ব্যবস্থা করতে না পারলে হারাম অর্থ দিয়েই ঋণ পরিশোধ করে দিবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৯)

নাবালেগের হজ্জের বিধান: নাবালেগ যদি পিতা-মাতা বা অন্য কারো সাথে হজ্জ করে তাহলে তার এই হজ্জ নফল বলে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর হজ্জ ফরয হলে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। অন্যথায় হজ্জের ফরয আদায় হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৬)

ফকীর হয়ে গেলে: কারো উপর হজ্জ ফরয হয়েছিল, কিন্তু সে যে কোনো কারণে হজ্জ করেনি, ইতোমধ্যে সে ফকীর হয়ে গেল, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরযই থেকে যাবে। যার উপর একবার হজ্জ ফরয হয়, আদায় করা ছাড়া তার থেকে এই ফরয আর রহিত হয় না। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৯৭)

মীকাত প্রসঙ্গ

যারা দূরবর্তী এলাকা থেকে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওনা হবে, তাদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করার আগে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়া ওয়াজিব। ঐ নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলে। কেউ যদি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে আবার তাকে মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধতে হবে, অন্যথায় তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

বাংলাদেশীদের মীকাত: বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আকাশ পথে গমনকারীদের বিমান করনুল মানাযিল ও যাতু ইর্ক বরাবর হয়ে মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করে বলে প্রতীয়মান হয় এবং বিমান জেদ্দা অবতরণের সাধারণত ২০/২৫ মিনিট পূর্বে মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করে। এ জন্য আকাশপথে গমনকারীদের নিজ বাসা, দেশের বিমানবন্দর কিংবা ট্রানজিট বিমান বন্দর অথবা বিমান জেদ্দায় অবতরণের কমপক্ষে ২০-২৫ মি. পূর্বে ইহরাম বেঁধে নিতে হবে, অন্যথায় দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। (জাওয়াহিরুল ফিক্হ ১/৪৬৫, আহকামে হজ্জ ৩৭-৪২)

হারাম-এর পরিচয়

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে বাইতুল্লাহ শরীফের চারদিকে কিছু এলাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর নির্ধারণকৃত সীমানাকে 'হারাম' বলে । এই সীমানার ভেতরের গাছগাছালি কাটা, পশুপাখি ধরা বা মারা এবং এখানে যুদ্ধবিগ্রহ করা নিষেধ। ইহরাম অবস্থায় হোক বা ইহরাম ছাড়া হোক। (মানাসিক পৃ. ৩৮৬-৮৭)

হিল-এর পরিচয়

হারাম এবং মীকাতের মধ্যবর্তী স্থানকে 'হিল' এবং এই স্থানের অধিবাসীদেরকে 'আহলে হিল' বা 'হিল্লী' বলে। এদের জন্য হারামের অধিবাসীদের মতো কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। হারামের সীমানা এদের জন্য মীকাত। এরা হজ্জ বা উমরা করতে চাইলে হারামের সীমানায় প্রবেশের আগেই ইহরাম বাঁধতে হবে। হজ্জ বা উমরা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে ইহরাম ছাড়াই প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীরা যে কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের দেশের শ্রমিকরা যদি সরাসরি মক্কায় যায়, তাহলে তাদেরও মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে। এরপর উমরা করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে কর্মস্থলে যাবে। অন্যথায় গুনাহ হবে এবং দম ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৩, কিতাবুল মাসাইল ৩/১০৫-৬)

উল্লেখ্য, মীকাতের বাহির থেকে যাদের বারবার মক্কায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় (যেমন: ব্যবসায়ী, বাসচালাক, টেক্সিচালক ইত্যাদি) তাদের যেহেতু বারাবর ইহরাম বেঁধে মক্কায় যাওয়া বেশ কষ্টকর, তাই তাদের জন্য শাফেয়ী মাযহাবের উপর আমল করত ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করা জায়িয হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/১১১)

হজ্জের প্রকারসমূহ

হজ্জ তিন প্রকার। যথা : ১. কিরান ২. তামাত্তু ৩. ইফরাদ

১. কিরান: কিরান সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ। হজ্জে কিরানের মধ্যে হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বাঁধা হয় এবং একই সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম খোলা হয়। উমরা শেষ করার পরে হালাল হওয়া যায় না, অর্থাৎ উমরা করার পর মাথার চুল কামানো বা ছাঁটা যায় না এবং ইহরামের সময় নিষিদ্ধ কোনো কাজও করা যায় না। যারা শেষের দিকে যায় তাদের জন্য এ প্রকার হজ্জ করা উত্তম ও সহজ।

২. তামাত্তু: কিরানের পর তামাত্তুর ফযীলত বেশি। 'তামাত্তু অর্থ ফায়দা হাসিল করা। হজ্জে তামাত্তুর জন্য প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ যেতে হয় এবং বাইতুল্লাহ শরীফে পৌছে উমরার কাজ শেষ করে হালাল হয়ে যেতে হয়। এরপর যিলহজ্জের সাত বা আট তারিখে মিনায় যাওয়ার সময় হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত স্বাভাবিক পোশাকে থাকতে পারে। মাঝের এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে থেকে ফায়দা হাসিল করা (যেমন: সেলাই করা কাপড় পরা, খোশবু ব্যবহার করা, চুল-নখ ইত্যাদি কাটা, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা)-কেই তামাত্তু বলে। তামাত্তু হজ্জে হজ্জ ও উমরার জন্য দুইবার ইহরাম বাঁধতে হয় ও দুইবার খুলতে হয়। প্রথমবার উমরার জন্য দ্বিতীয়বার হজ্জের জন্য।

৩. ইফরাদ: ইফরাদ হজ্জের ফযীলত কিরান ও তামাত্তুর তুলনায় কম। 'হজ্জে ইফরাদ' অর্থ শুধু হজ্জ করা। মীকাত থেকে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌছে

একটি তাওয়াফ করবে (তাওয়াফে কুদূম যা সুন্নাত)। এরপর হজ্জের কার্যক্রম শেষ হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। এ হজ্জে **১০**ই যিলহজ্জের পূর্বে কোনো উমরা নেই। উমরা করতে চাইলে হজ্জের কার্যাদি শেষ করার পরে (**১৩**ই যিলজ্জের পর) করতে পারবে। তবে **১৩** তারিখের পর উমরা করলে ঐ উমরার দ্বারা এই হজ্জ তামাত্তু বা কিরান হবে না। কারণ তামাত্তু বা কিরান হওয়ার জন্য হজ্জের আগে উমরা করা শর্ত। (রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩১ রশীদিয়া, মানাসিক ৭৪)

হজ্জে তামাত্তুর ব্যাখ্যা

যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক তামাত্তু হজ্জ করে। নিম্নে এ প্রকার হজ্জের ব্যাখ্যা দেয়া হলোঃ

হজ্জে তামাত্তুর জন্য প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধতে হয়। উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থেকে হজ্জের সময় এলে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হয়।

তামাত্তু হজ্জের উত্তম সূরতঃ তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য উত্তম হলো, 'প্রথমে মদীনা সফর শেষ করে হজ্জের জন্য মক্কা শরীফ আসা। মদীনা থেকে আসার সময় উমরার ইহরাম বেঁধে নেয়া। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা পালন করা, এরপর হজ্জের সময় নতুন ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা।' অথবা 'প্রথমে মক্কায় গিয়ে উমরা করা। এরপর হজ্জের সময়ে হজ্জের সব কাজ শেষ করে **১২/১৩** যিলহজ্জ বিদায়ী তাওয়াফ করে মদীনায় যাওয়া।'

ইহরামের আলোচনা

ইহরামের প্রস্তুতিঃ ইহরামের প্রস্তুতির নিয়তে প্রথমে সুন্নত তরীকায় মোচ, নখ এবং শরীরের অতিরিক্ত পশম পরিষ্কার করে নিবে।

* সফরে বের হওয়ার আগে ইহরামের নিয়তে গোসল করে নিবে। গোসল সম্ভব না হলে শুধু উযূ করলেও চলবে।

* গোসলের পর পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরবে। মোটা একটা কাপড় লুঙ্গির মত পরবে, আর একটা কাপড় চাদরের মত গায়ে দিবে। পরিধানের কাপড়টি যেহেতু সেলাইবিহীন তাই সতর যেন খুলে না যায় সেদিকে খুব খেয়াল রাখবে। ইহরামের কাপড় সেফটিপিন দিয়ে আটকাবে না।

* পুরুষগণ শরীরে আতর লাগাবে; ইহরামের কাপড়ে নয়।

ইহরাম বাঁধার স্থানঃ যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদীনায় যাবে, তারা মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধবে। যুলহুলাইফা মদীনা শহর থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে। কিন্তু যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মক্কায় যাবে, তাদের জন্য ঢাকা থেকেই (বাসা বা বিমানবন্দর থেকে অথবা বিমান যদি পথে বিরতি দেয় সেখান থেকে) ইহরাম বেঁধে নেয়া ভালো। মনে রাখতে হবে, ইহরামের সব কাপড় যেন লাগেজ বা বড় ব্যাগে না দেয়া হয়। কারণ লাগেজ/ বড় ব্যাগ বিমানকর্তৃপক্ষের দায়িত্বে চলে যায়। বিমান থেকে অবতরণের পূর্বে আপনি সেটা কাছে পাবেন না।

ইদানিং যেহেতু বিমানের শিডিউল ঠিক থাকে না, আবার অনেকের ফ্লাইটও বাতিল হয়ে যায়, তাই বাসায় ইহরাম না বাঁধাই ভাল। তবে ইহরামের কাপড় বয়ে নেয়ার চেয়ে ভালো হল, বাড়ি থেকেই ইহরামের কাপড় পরে নেয়া। কিন্তু তখন ইহরাম বাঁধবে না। অর্থাৎ উমরা বা হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে না।

মনে রাখতে হবে, নিয়ত ও তালবিয়া পড়া ছাড়া শুধু ইহরামের কাপড় পরলে ইহরাম বাঁধা হয় না। তেমনি মাথা না মুণ্ডিয়ে শুধু ইহরামের কাপড় খুললে ইহরাম ভঙ্গ হয় না।

ইহরাম বাঁধার পদ্ধতিঃ যারা সরাসরি মক্কায় যাবে, তারা ফ্লাইট নিশ্চিত হওয়ার পর হজ্জ ক্যাম্পে বা বিমান বন্দরের ওয়েটিং রুমে বসে থাকার ফাঁকে উযু করে নামায ঘরে গিয়ে, মাকরূহ ওয়াক্ত না হওয়ার শর্তে টুপি মাথায় দিয়ে বা মাথা ঢেকে, সম্ভব হলে ভিন্নভাবে ইহরামের উদ্দেশ্যে দুই রাকআত নামায পড়ে নিবে। ইহরামের উদ্দেশ্যে এই দুই রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব। প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। অন্য কোনো সূরা পড়লেও চলবে। মাকরূহ ওয়াক্ত হওয়া কিংবা অন্য কোনো কারণে এই নামায পড়তে না পরলেও কোনো সমস্যা নেই। নামাযের পর মাথার টুপি খুলে ফেলবে। অতঃপর উমরার নিয়ত করে 'তালবিয়া' পড়লেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে। তামাত্তু হজ্জকারী যেহেতু প্রথমে উমরা করবে, তাই প্রথমবার ইহরাম বাঁধার সময় শুধু উমরার নিয়ত করবে।

উমরার ইহরামের নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ اَلْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য উমরার নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে কবূল করে নিন।' নিয়ত আরবীতে করা জরুরী নয়।

তালবিয়াঃ উমরার নিয়তের পর তালবিয়া পড়বে। তালবিয়া নিম্নরূপঃ

(١) لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ

(٢) لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكْ

(٣) إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكْ

(٤) لَاَ شَرِيكَ لَكْ

পুরুষগণ উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া পড়বে। মহিলারা নিচুস্বরে পড়বে। যখনই পড়বে তিনবার পড়বে। আর তালবিয়ার চার বাক্য চার শ্বাসে পড়া মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯২ যাকারিয়া)

বি. দ্র. অধিকাংশ হাজী অন্যের সাথে সুর মিলিয়ে তালবিয়া পড়ে, এটা ভুল প্রথা। আর অনেকেই তালবিয়ার তৃতীয় বাক্যটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করে না, তাই এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

মহিলাদের ইহরামঃ ইহরামের প্রস্তুতির জন্য পুরুষরা যা যা করে মহিলারাও সেগুলো করবে। পার্থক্য এতটুকু যে, গোসলের পর মহিলারা নিজেদের স্বাভাবিক কাপড় তথা ঢিলেঢালা ফুল হাতার সেলোয়ার-কামিজ ও ওড়না পরবে। এরপর এমন বোরকা পরবে যা চেহারা আবৃত করবে বটে কিন্তু তার নেকাব চেহারার সাথে লেগে থাকবে না। কারণ, পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা হারাম আবার চেহারার সাথে কোনো কাপড় লেগে থাকাও নিষেধ। (যে-সব মহিলা চেহারা খোলা রাখবে এবং যে-সব পুরুষ ইচ্ছাকৃত তাদের দিকে তাকাবে, তাদের গুনাহ হবে। ফলে তাদের 'হজ্জে মাবরুর' নসীব হবে না।) আমাদের দেশে বাইতুল মুকাররামসহ আরো অনেক জায়গায় ক্যাপের মত একটা জিনিস পাওয়া যায়, কিন্তু ক্যাপের সামনের অংশ যত লম্বা এটা তত লম্বা নয় বরং এক দেড় ইঞ্চির মত লম্বা হবে, দেখতে অনেকটা ২/৩ তারিখের চাঁদের মত– সেটা পরে তার উপর দিয়ে নেকাব পরবে। তাহলে চেহারার পর্দাও হয়ে যাবে আবার নেকাব চেহারার সাথে লেগেও থাকবে না। মহিলারা ইহরামের উদ্দেশ্যে দুই রাকআত নামায পড়ার পর হজ্জ বা উমরার নিয়ত করে পুরুষদের মতই তিনবার তালবিয়া পড়বে, তবে উচ্চ স্বরে নয়, নিম্ন স্বরে। মহিলারা হায়েয-নেফাস অবস্থায়ও ইহরাম বাঁধতে পারবে। তবে তখন পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য গোসল করা ভালো। (মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ. ৯০)

বি.দ্র. অনেকে মনে করে, ইহরাম অবস্থায় মেয়েদের চেহারা খোলা রাখতে হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এক ফরয আদায় করতে গিয়ে আরেক ফরয তরক করার শামিল। তাই আমরা যেভাবে চেহারা ঢাকার কথা বলেছি সেভাবে ঢাকতে হবে। অন্যথায় গুনাহ হবে।

নাবালেগের ইহরামঃ নাবালেগ বাচ্চা বুদ্ধিমান হলে নিজের ইহরাম নিজেই বাঁধবে এবং হজ্জ ও উমরার যাবতীয় কাজ

নিজেই করবে। কোনো ওযর ছাড়া তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ ইহরাম বাঁধলে বা তার হজ্জের কাজ অন্য কেউ করে দিলে সহীহ হবে না। নাবালেগ বাচ্চা যদি বুদ্ধিমান না হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক ইহরাম বাঁধবে। তার নিজের ইহরাম বাঁধা ধর্তব্য হবে না। তবে নাবালেগ বাচ্চা যদি ইহরাম বাঁধা ছাড়াই পিতা-মাতা বা অন্য কারো সাথে হজ্জের সফরে যায় তাহলেও কোনো গুনাহ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩৫-৩৬ রশীদিয়া)

বোবার ইহরাম: বোবা ব্যক্তির ইহরাম বাঁধার জন্য তালবিয়া পড়তে হবে না। তার জন্য হজ্জের নিয়তই ইহরাম বলে গণ্য হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/১৮১-৮২ যাকারিয়া)

বেহুশ ব্যক্তির ইহরাম: হজ্জ বা উমরার সফরে বের হয়ে ইহরাম বাধাঁর আগেই যদি কেউ বেহুশ হয়ে যায়, আর মীকাত অতিক্রম করার আগে হুশ ফেরার সম্ভাবনা দেখা না যায়, তাহলে তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে কেউ নিজের ইহরাম বাঁধার সময় বা নিজের ইহরাম বাঁধার পরে ঐ বেহুশ সঙ্গীর পক্ষ থেকেও ইহরামের নিয়ত করে নিবে। এর দ্বারা তারও ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৪৮-৪৯ যাকারিয়া)

অভিজ্ঞতা: *অনেককে দেখা যায় ভুলে বা না বুঝে ইহরামের কাপড় বড় ব্যাগ বা লাগেজে দিয়ে দেয় যা বিমানের মালঘরে রাখা হয়। ইহরামের কাপড় সাথে না থাকায় তারা বিমানবন্দরে বা মীকাত অতিক্রম করার আগে ইহরাম বাঁধে না। ফলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হয়ে যায়। তারা মনে করে, ইহরামের কাপড় ছাড়া ইহরাম বাঁধা যায় না, অথচ ইহরাম সহীহ হওয়ার জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করা কোনো শর্ত নয়। অতএব যারা এ ধরনের সমস্যায় পড়বে, তারা সাধারণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় বিমান মীকাত অতিক্রম করার ঘোষণা দেয়ার সময় উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে নিবে। এর দ্বারাই ইহরাম হয়ে যাবে। কারণ মূলত নিয়ত করে তালবিয়া পড়ার নামই ইহরাম। তারপর জেদ্দা বিমানবন্দরে সামান হাতে পাওয়ার পর সাধারণ পোশাক খুলে ইহরামের লেবাস পরে নিবে। ইহরাম বাঁধার পর বার ঘন্টার কম সময় সাধারণ কাপড়ে থাকলে দম ওয়াজিব হয় না (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৭৭ যাকারিয়া)।*

ইহরাম বাঁধার পর দু'টি কাজ

১. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া। যে কোনো স্থান ও অবস্থার পরিবর্তনে তালবিয়া পড়া সুন্নাত। যেমন: ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, বাসে, বিমানে, প্রত্যেক নামাযের পর, উপরে উঠার সময়, নিচে নামার সময়, ঘুমানোর আগে ও পরে। মোটকথা সব জায়গায় তালবিয়া পড়তে থাকা, এমনকি কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আগে তালবিয়া পড়া, তারপর সালাম দেয়া। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৯২ যাকারিয়া)

* প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে তালবিয়া পড়বে। মুআল্লিম বা অন্য কারো সাথে তালমিলিয়ে পড়বে না। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫০২ যাকারিয়া)

* যখনই তালবিয়া পড়া হবে, একসঙ্গে তিনবার পড়া মুস্তাহাব। (মানাসিক পৃ. ১০২-১০৩)

২. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বেঁচে থাকা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের বর্ণনা

নিষিদ্ধ কাজসমূহ কয়েক ভাগে বিভক্ত :

১. আল্লাহর হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: কোনো প্রকারের গুনাহ করা।

২. শরীর ও কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : ক. পুরুষদের জন্য মাথা, চেহারা, পায়ের পাতা ঢেকে রাখা। তাই এমন জুতা পরতে পারবে না যা দ্বারা পায়ের পাতা ঢেকে যায়। মহিলাগণ মাথা, চেহারা ঢেকে রাখবে কিন্তু নেকাব যাতে চেহারায় লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবে। **খ.** চুল, মোচ, নখ ইত্যাদি কাটা। **গ.** গোসলের সময় ইচ্ছাকৃত শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা। **ঘ.** কাপড় বা শরীরে কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা। তাই আতর, সেন্ট, সুগন্ধিযুক্ত তেল, সাবান, স্নো, পাউডার ইত্যাদি কোনো কিছুই ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি পানের সাথে সুগন্ধি জর্দা খাওয়াও মাকরূহ। মেহেদি খোশবুর অন্তর্ভুক্ত তাই পুরুষ-মহিলা কেউই মেহেদি ব্যবহার করতে পারবে না। **ঙ.** পুরুষদের জন্য শরীরের যে কোনো অঙ্গের গঠনে সেলাই করা কাপড় পরা। যথা : পাঞ্জাবি, সেলোয়ার, জোব্বা, শার্ট, গেঞ্জি, সোয়েটার, কোর্ট, জাঙ্গিয়া, মোজা ইত্যাদি। (মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ. ১১৭)

উল্লেখ্য, যদিও সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরা উত্তম কিন্তু সেলাই করা লুঙ্গি পরাও জায়েয আছে। বিশেষত এমন বয়োবৃদ্ধ হাজী যার সতর খুলে যাওয়ার বেশ আশংকা আছে, তার জন্য সেলাই করা লুঙ্গি পরাই উত্তম। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯, আহকামে হজ্জ পৃ. ৩৪)

৩. স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন **:** স্ত্রীর সাথে যৌন উত্তেজক কোনো কথাবার্তা বলা। স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কোনো কাজ করা। তবে স্ত্রীর পাশে বসা বা চলাচলের সময় স্ত্রীর হাত ধরতে কোনো সমস্য নেই। কিন্তু স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় শোয়া বা ঘুমানো উচিত নয়। (মানাসিক পৃ. ১১৯)

৪. সাথীদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : সাথীর সাথে কিংবা অন্য যে কোনো মানুষের সাথে ঝগড়া করা। কারো কোনো জিনিস না বলে নেয়া।

হজ্জের সফরে যথাসম্ভব অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা। (মানাসিক পৃ. ১১৭)

উল্লেখ্য, কোনো পতিত জিনিস ধরবে না। পতিত জিনিস ধরলে বা উঠালে চোর সাব্যস্ত হয়ে জেলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে পতিত জিনিসের মালিককে বলা যেতে পারে যে, আপনার সামান উঠিয়ে নিন।

৫. প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন : বন্য পশু শিকার করা বা কোনো শিকারীকে সাহায্য করা। উকুন মারা এবং মারতে সাহায্য করা । (মানাসিক পৃ. ১১৯)

ইহরাম অবস্থায় যে-সব কাজ করা যায়

* ইহরাম অবস্থায় মাথা ও মুখ ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর কাঁথা, কম্বল, চাদর ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা যায়। মাথা ও গাল বালিশে রেখে শোয়া যায় । তবে সম্পূর্ণ চেহারা বালিশে রেখে উপুড় হয়ে শোয়া যাবে না। (মানাসিক পৃ. ১২৩)

* ইহরাম অবস্থায় ইহরামের কাপড় ময়লা বা নাপাক না হলেও পরিবর্তন করা যায় । অনেকে মনে করে, ইহরামের চাদর খুললেই ইহরাম খুলে যায়। একথা ঠিক নয়। হলক বা তাকসীর তথা চুল মুণ্ডানো বা ছোট করার পূর্বপর্যন্ত ইহরাম খুলবে না। (মানাসিক পৃ. ৯৮)

* ইহরামের কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে পরা যায় । (মানাসিক পৃ. ৯৮)

* সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার না করে গোসল করা যায় । তবে ইচ্ছাকৃত শরীরের ময়লা উঠানো যাবে না। (মানাসিক পৃ. ১২০)

* সুঘ্রাণযুক্ত ফল-মূল খাওয়া যাবে। তবে ইচ্ছাকৃত ফল বা ফুলের ঘ্রাণ নিবে না। (মানাসিক পৃ. ১২১,১২৪)

* ঘ্রাণমুক্ত লিপজেল, ভ্যাসলিন ঠেকাবশত ব্যবহার করা যায় । (কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬২)

* সেলাইযুক্ত বেল্ট, ব্যাগ, স্যান্ডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা । (মানাসিক পৃ. ১২২)

* মাথা ও চেহারা না ঢাকার শর্তে কান ঢাকা। [বর্তমানে কান ঢাকার জন্য ইয়ারফোন আকৃতির যে বস্তু পাওয়া যাচ্ছে তা ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে।] (কিতাবুল মাসাইল ৩/১৩৮)

* ইহরাম অবস্থায় গৃহপালিত পশু যেমন : হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি জবাই করা এবং মাছ শিকার করা যায় । (মানাসিক পৃ. ১১৯)
* ইহরাম অবস্থায় মশা-মাছি, সাপ-বিচ্ছু, পোকা-মাকড়, পিঁপড়া, হিংস্র জানোয়ার মারা যায় । পিঁপড়া কষ্টদায়ক না হলে মারা যাবে না। (মানাসিক পৃ. ১২৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫২)
* দাঁত উঠানো, ফোঁড়া-বিচি ইত্যাদি গেলে ফেলা, ভাঙ্গা নখ কেটে ফেলা এবং ব্রাশ করা যাবে। তবে সুগন্ধি পেস্ট ব্যবহার করা যাবে না। (মানাসিক পৃ. ১২২)
* ইহরাম অবস্থায় চশমা, ঘড়ি, আংটি, মাফলার ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮৯)

ইহরাম সম্পর্কীয় মহিলাদের বিশেষ কিছু মাসাইল

* মহিলারা পায়ের পাতা ঢেকে ফেলে এমন জুতা, হাত ও পায়ের মোজা, জাঙ্গিয়া-পেন্টি ইত্যাদি পরতে পারবে। (মানাসিক পৃ. ১১৫)
* মাসিক বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব চলাকালীনও ইহরাম বাঁধতে পারবে। তাওয়াফ, নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও মসজিদে প্রবেশ ব্যতীত ঐ অবস্থায় হজ্জের অন্য সব কাজই করতে পারবে। (মানাসিক পৃ. ৯০)
* স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকার পরতে পারবে। তবে ইহরাম অবস্থায় অলংকার না পরাই ভালো। (মানাসিক পৃ. ১১৬)
* ইহরাম অবস্থায় চুলে তেল দেয়া, সিঁথি করা নিষেধ। চুল বেঁধে রাখতে পারবে। তবে চুল না আঁচড়ানোর কারণে যদি খুব বেশি সমস্যা হয়, চুলে জট লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে সাজসজ্জার নিয়ত ছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী বড় দাঁতের চিরুনি দ্বারা চুল আঁচড়ানো যাবে। (মানাসিক পৃ. ১২৪, গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ৮৯-৯০)
* কালো বোরকা ব্যবহার করতে পারবে। অনেকে সাদা বোরকা ব্যবহার জরুরী মনে করে। এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। (মানাসিক পৃ. ১১৫)
* মেহেদি, লিপস্টিক ঘ্রাণমুক্ত হলেও ব্যবহার করা যাবে না। (গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ৯০)
* মক্কায় অবস্থানকালে মহিলারা হজ্জের ইহরাম বাসাতেই বাঁধবে। মহিলাদের ইহরামের জন্য মসজিদে হারামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। (মানাসিক পৃ. ১১৫)
* চুল ধোয়ার জন্য সুগন্ধিযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করা যাবে না। বর্তমান বাজারের সব শ্যাম্পুই সুগন্ধিযুক্ত, তাই ইহরাম অবস্থায় শ্যাম্পু ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। (কিতাবুল মাসাইল ৩/১৬৩)

ইহরাম বাঁধার পর যেতে না পারলে করণীয় : হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর যে কোনো কারণবশত মক্কায় যেতে না পারলে ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং ইহরাম অবস্থার নিষেধাজ্ঞাসমূহও মেনে চলবে। অতঃপর যখন যাওয়া সম্ভব হয়, তখন গিয়ে হজ্জ বা উমরা আদায় করে ইহরাম থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ইহরাম অবস্থায় থাকা যদি কষ্টকর হয়, তাহলে কারো মাধ্যমে মক্কায় হারামের সীমানার ভেতর উমরা ও ইফরাদ হজ্জের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটি বকরী বা দুম্বা জবাই করাবে। আর কিরান হজ্জের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দু'টি বকরী বা দুম্বা জবাই করাতে হবে। বকরী বা দুম্বা জবাই হওয়ার পরই হালাল হয়ে যাবে অর্থাৎ ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে। তবে জবাইয়ের পর হলক বা তাকসীর তথা চুল মুণ্ডানো বা ছোট করে নেয়া উত্তম ।

অতঃপর যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম থেকে হালাল হবে সে পরবর্তীতে একটি উমরা কাযা করে নেবে। আর ইফরাদ হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হলে একটি উমরা ও একটি হজ্জ কাযা করতে হবে। কিরান হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হলে দু'টি উমরা ও একটি হজ্জ করতে হবে। তবে যদি ঐ বছরই হজ্জ করা সম্ভব হয়, তাহলে অতিরিক্ত উমরাটি করতে হবে না। (মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ. ৪১৭-২৭)

ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে করণীয় : কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে সাধারণ মাইয়্যেতের মতই গোসল করাতে হবে এবং কাফন-দাফন করতে হবে। তার চেহারাও ঢাকা যাবে এবং আতর ও কর্পূরও ব্যবহার করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৮৮)

* যে বছর হজ্জ ফরয হয়েছিল সে বছর ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে ঐ ব্যক্তির ওয়ারিসদের জন্য ঐ হজ্জের বদলী করানো জরুরী নয়। আর যদি হজ্জ ফরয হওয়ার বছর ইহরাম বেঁধে না থাকে বরং পরবর্তী কোনো বছর ইহরাম বেঁধে থাকে এবং উকূফে আরাফার আগে মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার দেশ থেকে বদলী হজ্জ করানো জরুরী। আর উকূফে আরাফার পরে মারা গেলে বদলী হজ্জ করাতে হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫২২)

অভিজ্ঞতা : *১. মনে রাখতে হবে, বিমানের মধ্যে এবং লাগেজ হাতে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে-সব জিনিস প্রয়োজন হবে (যেমন : গামছা, জায়নামায, ঔষধ, কিছু শুকনো খাবার ইত্যাদি) সেগুলো নিজের সাথে রাখবে অর্থাৎ হাতব্যাগে রাখবে। যাতে পথে কোনো অসুবিধা না হয়।*

২. জেদ্দায় পৌঁছার পর প্রথমে ইমিগ্রেশন পার হতে হয়। ইমিগ্রেশনের পর সামান্য সামনে এগুলেই সামানপত্র বুঝে নেয়ার স্থান। কর্তৃপক্ষ বিমান থেকে লাগেজ নামিয়ে সেখানে জমা করতে থাকে। সেখান থেকে নিজের লাগেজ বুঝে নিতে হবে। তারপর একটু সামনে অগ্রসর হলেই কাস্টমচেকইন। সেখানে মেশিনে চেক করানোর পর দরজার কাছে গেলে কুলিরা লাগেজ তাদের গাড়িতে তুলে নিবে এবং বাংলাদেশ হজ্জমিশনে পৌঁছে দিবে। অপরদিকে মুআল্লিমের লোকেরা পাসপোর্টে বাস ভ্রমণের টিকিট লাগিয়ে দিবে। টাকা পয়সা টিকিট ইত্যাদি নিজের গলায় ঝুলানো ব্যাগে রাখবে। এ পর্যন্ত বিমানবন্দরের কাজ শেষ।

এখন বাসযোগে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে সামান্য দূরে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের স্থানে (বিমান বন্দরের গেট থেকে বের হয়ে ডান দিকে) পৌঁছতে হবে এবং কুলিরা মাল-সামান আনার পর নিজের লাগেজ বুঝে নিতে হবে। তারপর বাসে উঠার আগ পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশ হজ্জমিশন বিশাল তাবু সদৃশ একটা স্থান। সেখানে উযূ-ইস্তিঞ্জা ও নামাযের সুব্যবস্থা আছে। এয়ারপোর্ট-কর্মীদের নিকট সৌদির বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর সীম পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকটি সীমে মূল্যের সমপরিমাণ 'ফ্রী' কথা বলার সুযোগ থাকে। সেখানে বিভিন্ন রকমের খাবারও পাওয়া যায়। প্রয়োজন হলে সীম ও খাবার সংগ্রহ করতে পারবে।

৩. মক্কায় পৌঁছার পর প্রথমে মুআল্লিমের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন পরিচয়পত্র দেয়া হয়, যা গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হয় এবং হাতে পরতে হয়। এসব পরিচয়পত্র যত্নের সাথে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং হাতে পরতে হবে। এরপর হাজীদেরকে তাদের জন্য ভাড়াকৃত বাসা বা হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসা বা হোটেলে গ্রুপলিডার যে কামরা দিবে সেখানে নিজের সিট নিবে। সিট পাওয়ার পর উমরার জন্য তাড়াহুড়া করবে না বরং ধীরে সুস্থে নিজেকে উমরার জন্য প্রস্তুত করবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে। সম্ভব হলে গোসল করবে। কাপড় পরিবর্তন করে প্রয়োজনে কিছু খেয়ে নিবে। এরপর খোঁজ-খবর নিয়ে যখন ভিড় কম মনে হবে, তখন উমরার নিয়তে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হবে।

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-সহ কয়েকজন

বুযুর্গানে দীনের হজ্জ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম

পটভূমি

হজ্জ বিষয়ক এ লেখাটি মূলত হজ্জের হাকীকত তথা রূহানিয়াত সম্পর্কিত। যে-সব আল্লাহওয়ালার সোহবত হতে সরাসরি শুনে দরদী মালীর মতো (ফুলের বদলে কথার) মালা গেঁথে এ লেখাটি সাজানো হয়েছে তাঁরা সবাই আজ কবরজগতের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে একজন (কাকরাইলের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বী ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.) ছাড়া সকলেই বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম। রূহানী হজ্জ সম্পন্ন করে হজ্জে মাবরূরের উপর আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকৃত সমস্ত ইন'আম লাভ করতে আগ্রহী সারাবিশ্বের সকল হজ্জযাত্রীর খেদমতে এসব আল্লাহওয়ালার পবিত্র যবান হতে নিঃসৃত বয়ান ও বাণী তারিখ ও স্থান উল্লেখপূর্বক পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হল।

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ.

[তিনি ছিলেন হযরতজী মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ.-এর বিশেষ সোহবতপ্রাপ্ত। হযরতজীর পক্ষ হতে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরিত হয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অধিককাল সীমাহীন কুরবানীর সাথে তাবলীগ জামাআতের আমীর হিসেবে সেখানে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাধারে নয় বছর বাংলাদেশের টঙ্গীতে পুরানাদের জোড় উপলক্ষে আগমন করেছেন। এ সময় হাজী আব্দুল মুকীত সাহেবের নির্দেশে আমি তার সফরসঙ্গী ও সার্বক্ষণিক বয়ানলেখক হিসেবে সোহবত লাভে ধন্য হয়েছি। একদিন ফজর নামাযের পরপর তিনি হজ্জের রূহানিয়াত সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। বয়ানের অংশবিশেষ এই–]

স্থান: টঙ্গী

তারিখ: ২৭/০৮/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

রোজ: রবিবার

লোকেরা খুব বেশি পেরেশানীর এযহার (প্রকাশ) করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এমন এক এলাজ (চিকিৎসা) বাতলে দিয়েছেন, যা সমস্ত পেরেশানীর একমাত্র এলাজ।

কিন্তু আমাদের অভ্যাস হল, যে এলাজ আল্লাহ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করবো না, যাবো তথাকথিত বুযুর্গের কাছে...। কারণ কী? কারণ, আল্লাহ যে এলাজ বলেছেন, তা নফসের (মনের) চাহিদার খেলাফ। আর বুযুর্গের কথা নফসের তাবে' (অনুগামী)। অর্থাৎ, বুযুর্গ একটা তাবীয দিয়ে দিবেন, যা ধারণ করতে কোন মাশাক্কাত (কষ্ট) নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর দেয়া এলাজ নফসকে দমিয়ে দেয় (নফ্‌সকো কুচাল দেতা হ্যায়)।

এটা সেই এলাজ যা আল্লাহ পাক কওমে 'আদকে তাদের দুর্ভিক্ষের সময় বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু কে তা মানতে তৈরি? তখন তো সবাই (খাদ্য-পানীয়ের জন্য) পেরেশান। ঠিক যেমন আজ আমরাও তৈরী নই। আমরা আমাদের পেরেশানী দূর করতে এমন এলাজ কামনা করি, যেটা গ্রহণ করলে খাহেশাত (মনের চাহিদা) ছাড়তে হয় না।

হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. প্রত্যেক পেরেশানীতে প্রত্যেককে সেই এলাজের কথাই বাতলে দিতেন এবং বলতেন যে, এই এলাজ গ্রহণ করো, পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

কওমে 'আদকে আল্লাহ তা'আলা যে এলাজ বাতলে দিয়েছিলেন তা এই–

استغفروا ربكم ثم توبوا اليه...

অর্থাৎ, পিছনের গোনাহের জন্য মাফ চাও এবং যে যিন্দেগী যাপন করছো তা বদলে নাও। (সূরা হুদ-৯০)

যিন্দেগী বদলানোর মর্ম কী? আগে দুনিয়া (এবং দুনিয়ার লাভ) দেখে চলেছো, এখন আখেরাত (এবং আখেরাতের লাভ) দেখে চলো। "توبوا اليه" বাক্যের "اليه" শব্দে গায়েব (নামপুরুষ) সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আগে তুমি মুশাহাদা (চাক্ষুষদর্শন)-এর দিকে চলেছো, এখন গায়েব (অদৃশ্য)-এর দিকে চলো; আগে মাখলুকের দিকে চলছো, এখন খালেকের দিকে চলো।

এটাই খোদা-প্রদত্ত এলাজ। এই এলাজে নফস দমে যায়।

মা-বাপ, বিবি-বাচ্চা, ক্ষমতা-হুকুমত, আত্মীয়-স্বজন কাউকে দেখে চলবো না; আল্লাহকে দেখে চলবো।

এলাজ বড় আসান। কিন্তু নফসের খেলাফ হওয়ায় কেউ তা মানতে প্রস্তুত নয়। সবাই বলে, এমন এলাজ দাও যাতে (আগের যিন্দেগী) বদলাতে না হয় এবং যাতে দুনিয়া সামনে রেখেই চলতে পারি। (আল্লাহর পানাহ।)

তাওবা না করে বাইতুল্লাহয় কৃত দু'আ ধ্বংস ডেকে আনে।

কওমে 'আদকে তাদের নবী হযরত হুদ আলাইহিস সালাম এই এলাজই বলে দিলেন। কিন্তু তারা মানতে তৈরী হল না। মানুষ আল্লাহর হুকুম মানতে তৈরী না হলে তার যেহেনে (মস্তিষ্কে) সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন তদবীর (সমাধান) আসে, যা বাহ্যিকভাবে উপকারী মনে হয় কিন্তু বাস্তবে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক হয়। কওমে 'আদের যেহেনেও এমনই তদবীর আসল। তারা বলল, নবীর কথা বাদ দাও, (নবীকে মাধ্যম বানানোর দরকার কী?) আমরা বাইতুল্লাহয় গিয়ে (সরাসরি আল্লাহর কাছে) দু'আ করব। আর এতেই (অর্থাৎ তাদের এ কর্মপন্থার কারণেই) তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসে।

আজকাল মুসলমানও বলে, বাইতুল্লাহয় গিয়ে দু'আ কর (সমাধান হয়ে যাবে)। কিন্তু তাওবা না করে বাইতুল্লাহয় কৃত দু'আ তো ধ্বংস ডেকে আনে।

তাওবা না করে বাইতুল্লাহয় যাওয়ার মানে হল, আল্লাহর মুকাবিলা করা যে, আমি আমার যিন্দেগী বদলাবো না। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির লাব্বাইকের জবাবে বলেন, লা-লাব্বাইক, লা-সাদিক (না, তুমি উপস্থিত

হওনি, উপস্থিতির দাবিতে তুমি সত্যবাদী নও)। ফলে সে এমনভাবে হজ্জ থেকে ফিরবে যে, কোন গোনাহই তার মাফ হয়নি। (নাউযুবিল্লাহ)

আজ মুসলমান আল্লাহর সুন্নাত (সাধারণ নিয়ম) জানে না। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম ভালো করেই জানতেন, বাইতুল্লাহর দু'আ তাওবার পরই কবুল হয়।

মোটকথা যিন্দেগী পরিবর্তনের নিয়ত না থাকলে বাইতুল্লাহ গিয়ে মুসীবত আরও বেড়ে যাবে। আগে ছিল একটি, এখন হবে দু'টি।

তওবাওয়ালা হজ্জের প্রভাব

ঘটনা-১: একলোক জমি দখল করেছিল। হজ্জ করে এসে ফিরিয়ে দিল। মানুষের কাছে তার ইজ্জত বেড়ে গেল। এখন সবাই বলাবলি করে– বাইতুল্লাহর যিয়ারতকারী এমনই হয়!

ঘটনা-২: ভাই আব্দুর রহমান মেওয়াতী। একবার রাস্তায় সাত ভরি স্বর্ণ কুড়িয়ে পান। একটু অগ্রসর হয়ে দেখেন, একলোক অঝোরে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল, মেয়ের বিয়ের জন্য স্বর্ণ কিনেছিলাম, হারিয়ে গেছে। ভাই আব্দুর রহমান তাকে স্বর্ণ ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি খুশিতে আত্মহারা হয়ে তাকে সিজদা করতে উদ্যত হল। তিনি বললেন, আল্লাহকে সিজদা করো, (যিনি তোমাকে মুসীবত থেকে উদ্ধার করেছেন)। এ ঘটনায় সবাই বলাবলি করতে থাকে– *'ইনি মনে হয় হাজী সাহেব!'*

আর বর্তমান যামানায় লোকেরা বলে, এখনও হজ্জ করনি, এখনই মিথ্যা বলা শুরু করে দিয়েছো? (অর্থাৎ হাজী হলেই না লোকে মিথ্যা বলে, তুমি তো আর হাজী নও, তুমি কেন মিথ্যা বলছো?)

ইঞ্জিনিয়ার হাজী আ. মুকীত সাহেব রহ.

[কাকরাইলের শীর্ষস্থানীয় এই মুরুব্বী নিজে আলেম না হলেও ইলমে দীন ও আলেম-উলামার প্রতি তাঁর দিলের মহব্বত ও আদব-ইকরাম ছিল অপরিসীম। ফলশ্রুতিতে একজনকেও ইঞ্জিনিয়ার না বানিয়ে সবগুলো সাহেবযাদাকেই তিনি ইলমে দীন শেখা-শেখানোর খেদমতে ওয়াক্ফ করেছেন, বিশিষ্ট আলেম পরিবারের সঙ্গে সন্তানদের আত্মীয়তা করেছেন। ১৯৭৯-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ (বিশ) বছর তাঁর মূল্যবান সোহবত ও বিশেষ দিক-নির্দেশনা লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। ১৯৯৯ সালে আখেরী হজ্জের সফরে মক্কা মুকাররমার পবিত্র ভূমিতে আমাকে আলাদা করে বলা ও আম-মজমায় বলা হজ্জের রূহানিয়াত সম্পর্কিত তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্য বয়ানসমূহ হতে অংশবিশেষ তামাম উম্মতের খেদমতে পেশ করা হল।]

স্থান: কাকরাইল মসজিদ
তারিখ: ২৯/০৩/১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
রোজ : শনিবার

হজ্জের সওয়াব পেতে পারি যদি হাজীদের হজ্জ যাতে সহীহ হয় সেজন্যে মেহনত করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ২২ (বাইশ) বছর মেহনত করে তৈয়ার করে হজ্জে নিয়েছেন। এর দ্বারা বাইতুল্লাহয় হাযিরী দেয়া যে কত আহাম (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস সহজেই বুঝে আসে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আল্লাহর পছন্দনীয় গুণাবলীর ধারক হয়ে তারপর আল্লাহর দরবারে হাযিরী দিয়েছেন। এটা হল কীভাবে?

দাওয়াতের মেহনত করিয়ে, তা'লীম করিয়ে, যিকির ও নামাযের মাশক্ব করিয়ে, যাকাত আদায় করিয়ে, রোযা রাখিয়ে, খেদমত করিয়ে, হায়াতে তাইয়েবার মুকাম্মাল তসবীর (প্রতিকৃতি) বানিয়ে– যেখানে বদগুমানী নেই, হাসাদ নেই, কীনাহ নেই– এভাবে দিল পবিত্র করিয়ে ও আমলের মাশক্ব করিয়ে তারপর হজ্জে নিয়েছেন।

স্থান: কাকরাইল মসজিদ
তারিখ ২২/০৮/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
রোজ: শনিবার, বাদ যোহর

(হজ্জের আগে মেহনত করে দীনী মেজাজ বানানো জরুরী। কেননা) যে মেজাজ নিয়ে হজ্জে যাবে, যে মাহাওলের (পরিবেশের) প্রভাব নিয়ে যাবে সেভাবেই হজ্জ করবে।

সাহাবা রাযি. দুনিয়ার বেরুগবাতীর (অনাগ্রহের) সাথে, আখিরাতের ভয় নিয়ে, গুনাহ মাফ করাবার নিয়তে, নিজের ও উম্মতের হেদায়াতের নিয়তে হজ্জে যেতেন। এতদিনের দীনের মেহনত যেন কবুল হয় সে নিয়তে যেতেন।

কী আজব কথা! আজ আমি দুনিয়ার মধ্যে মশগুল থেকে তা থেকে উঠেই হজ্জে চলে যাই। হাজী যে জযবা নিয়ে বাইতুল্লাহয় হাযিরী দেয় এবং হাজারে আসওয়াদে চুমু খায় আল্লাহ তা'আলা তার দিলে সে জযবা পোক্ত করে দেন। যদি দুনিয়ার দিকে রোখ নিয়ে যায় তাহলে সেটা আরও পোক্ত করে দিবেন। আজ কত অল্প সময় পাচ্ছি। উচিত ছিল, সারা বছর মেহনত করে কমপক্ষে তিনচিল্লা দিয়ে হজ্জে পাঠানো। প্রত্যেক হাজীর সঙ্গে মুলাকাত করে হজ্জের গুরুত্ব বুঝিয়ে বুঝিয়ে তৈরী করা। হাজী সাহেবান হজ্জের তৈয়ারী বলতে মনে করেন ব্যবসা গোছানো। আসল তৈয়ারী তো তাকওয়া, ইলম ও আখলাক তৈরী করা। বাহ্যিক তৈয়ারীর পাশাপাশি বেশী মেহনত করতে হবে আভ্যন্তরীণ তৈয়ারীর উপর। তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, জানদার নামায এগুলো আভ্যন্তরীণ তৈয়ারী। বেচারা শুধু হজ্জের আরকান শিখে যায়। ঐ ৫/৬ দিনের আরকান নিয়েই সে চিন্তা করে। আগে-পরের অন্য কোন তৈয়ারী সে নেয় না।

হজ্জ সবার উপর ফরয না। কিন্তু হাজীকে তৈরী করে পাঠানো সবার উপর জরুরী। কিন্ত আমরা তা করি না। এজন্যই হজ্জের দ্বারা যা হওয়ার ছিল তা হচ্ছে না। হজ্জ তো সমস্ত আমলের তাকমীল (পূর্ণতা)। যিন্দেগীর পরিপূর্ণতা আসবে হজ্জের দ্বারা। অর্থাৎ, হজ্জের পর আর কোন কিছুতে দিল লাগবে না; দিলের রোখ পাল্টে যাবে, মাকসাদও পাল্টে যাবে। এখন তো হজ্জ থেকে ফিরে এসে দুনিয়ার প্রতি আরও ঝুঁকে পড়ে, একেবারে মত্ত হয়ে যায়। বরং একমাসে যা লোকসান হয়েছে তা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

হজ্জে যাওয়ার আগে আন্দারুনী তৈয়ারী (আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি) হয় না। হাজী তো সীনাভর্তি মহব্বত নিয়ে হজ্জে যাবে। সব রকম কষ্টকে মাহবুব (প্রিয়) মনে করবে। অথচ সেখানেও সে মানুষ সম্পর্কে সমালোচনা করে। খাবারের সমালোচনা করে। এভাবে সে হজ্জকে বরবাদ করে আসে। হাজী সাহেব টাকা-পয়সা, পদ-পজিশন, আসবাব-পত্র ও ইলম-কালামের ফখর (অহংকার) দেখিয়ে আসে। অথচ হজ্জে গিয়ে তার আরও নত হওয়ার কথা ছিল।

হজ্জের সফরে পাঁচটি আদবের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে:

১. বাইতুল্লাহর আদাব
২. মদীনা মুনাওয়ারার আদাব।

৩. বাইতুল্লাহর অধিবাসীদের আদাব।
৪. মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসীদের আদাব।
৫. সকল হাজী আল্লাহর মেহমান, কাউকে নারায করলে আল্লাহ নারায হবেন।
কত হাজী হজ্জের সফরে নামায কাযা করে। হজ্জের আরকান সম্পর্কেও আমাদের জাহালাত (অজ্ঞতা) আছে। হজ্জে যাচ্ছে, কিন্তু ইহরামও বাঁধতে জানে না!
হাজীর হজ্জ কবুল হলে সুপারিশ করে চারশত ব্যক্তি বা চারশত পরিবারকে বেহেশতে নিয়ে যাবে। হাফেযে কুরআন নিবে দশজনকে। কিন্তু হজ্জ কবুল হতে হবে তো!?
হজ্জ বানাবার জন্য আগে নামায বানাতে হবে। হাজীদেরকে তা'লীমের হালকায় বসানো। এতে সে অভ্যস্ত নয়। তার কাছে বাইতুল্লাহর তাওয়াফের কদর নেই। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে বাইতুল্লাহর জামাআত ছুটে যায়। *ফাযায়েলে হজ্জ* তা'লীম করবে। যত বেশি সম্ভব সময়গুলো বাইতুল্লাহয় কাটাবে।
১. তাওয়াফে ৬০ রহমত পাবে।
২. নামায পড়লে ৪০ রহমত পাবে।
৩. মহব্বতের নযরে বাইতুল্লাহর দিকে তাকালে ২০ রহমত পাবে।
বাইতুল্লাহয় গিয়েও যদি দিলে আল্লাহর মহব্বত না আসে, আল্লাহর সাথে তা'আল্লুক (সম্পর্ক) পয়দা না হয় তাহলে আর কোথায় গিয়ে হবে? এজন্য বাইতুল্লাহয় পৌঁছার আগেই বাইতুল্লাহর আযমত (মর্যাদা) দিলে বসানো।
হজ্জ হল তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, দুনিয়ার প্রতি বেরুগবাতী আর মাখলুকের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের নাম।
আরাফায় যাবো দুই নিসবতে (দুটি বিষয়কে উদ্দেশ্য বানিয়ে।)–
১. গুনাহ মাফ করানো।
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম নিয়ে দুনিয়ার কোনায় কোনায় ফেরার জযবা পয়দা করা। দাওয়াতের কাজকে কাজ বানানো।
তাওয়াফে যিয়ারত করে মুলতাযামে যখন দু'আ মাঙবে, দাওয়াতের কাজকে কাজ বানিয়ে কবুল হওয়ার জন্য দু'আ মাঙবে।

স্থান: কাকরাইল মসজিদ
তারিখ: ১২/০২/১৯৯৯
জুম'আ-বার, সকাল

বাইতুল্লাহয় হাযিরী আল্লাহর মহব্বতের সাথে হওয়া চাই, দুনিয়ার বেরুগবাতীর সাথে হওয়া চাই, আখেরাতের ফিকিরের সাথে হওয়া চাই এবং মউতের স্মরণের জন্য হওয়া চাই। ইহরামের কাপড় কেন? কেন সেলাই করা কাপড় পরা হয় না? মউতের স্মরণ করার জন্য।
অনেক হাজী বড় বড় ট্রাঙ্ক কিনে আনে, নানারকম সামান আনে। মাওলানা মুনীর সাহেব রহ. বড় শক্ত কথা বলেছেন– আগেকার হাজী হজ্জ করে ঈমান নিয়ে আসতো। এখনকার হাজী হজ্জ করে সামান নিয়ে আসে। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছেড়ে বাজারে তাওয়াফ করে। সে জানেই না, বাইতুল্লাহ শরীফে দৈনিক ১২০টি রহমত নাযিল হচ্ছে। আমরা জাহেল। হজ্জ সম্পর্কে একেবারেই জাহেল।

স্থান: মসজিদে ইজাবা, মক্কা মুকাররমা
তারিখ: ১৩ই যিলহজ্জ ১৪১৯ হিজরী, ৩০/০৩/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
রোজ: মঙ্গলবার, বাদ আসর

যারা হজ্জ করে ফিরে যাচ্ছে চার-চার মাসের তাশকীল কর। ওরা যাদের পাঠাবে চারমাস লাগিয়ে যেন পাঠায়। অজ্ঞ হিসেবে না পাঠায়। মহিলারা যেন তাওয়াফ ইত্যাদি করে; নফল নামায পড়তে পারে, কিন্তু বাইতুল্লাহয় এসে মসজিদুল হারামে যেন জামাআতে নামায না পড়ে এটা বলে দিও।

স্থান: কাসার হান্না ওয়ে, মক্কা মুকাররমা
তারিখ: ১৪ যিলহজ্জ ১৪১৯ হিজরী, ৩১/০৩/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
বুধবার, বাদ যোহর

আমাকে লক্ষ্য করে বলেন,
তুমি তো উলুল আলবাব, হজ্জ থেকে কী নিয়ে যাচ্ছো?... ইয়াকীন নিয়ে যাও। তালবিয়ায় যেমন বলেছো, তেমন শিরকমুক্ত ইয়াকীন নিয়ে যাও।
ফিকিরের ইসলাহ হওয়া দরকার। আমাদের দিলের চাহিদা বদলাতে হবে। আজ মেয়েদের চাহিদা গহনা, আমাদের চাহিদা গাড়ি-বাড়ি-ডিগ্রি ও পদমর্যাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাহিদাকে নিজের চাহিদা বানাতে হবে।
সবার যিন্দেগীতে যেন হেদায়াত এসে যায়। সবাই যেন আখেরাতের ধর-পাকড় থেকে বেঁচে যায়। ব্যস, আখেরাতের ফিকির। মুলতাযামে এ দু'আই করা।
রওযা শরীফে সালাম দেয়ার সময় ধ্যান করা যে, ইনি কী মেহনত করে শুয়ে আছেন এবং তাঁর পাশে শায়িত সাথীরাই বা কী মেহনত শেষে এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন? রওযা শরীফে নিজেকে আল্লাহর কাছে কবুল করানো চাই।
জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে সালাম দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা যে, ইনারা (সাহাবা রাযি.) যে মেহনত করে গেছেন তা যেন করতে পারি। সাহাবায়ে কেরামের ইত্তিবা (অনুসরণ) করতে হবে।

হযরত মাও. আব্দুল্লাহ দরখাস্তী সাহেব

[তিনি পাকিস্তানের বহুত বড় বুযুর্গ, হাফেযে হাদীস ও বিশিষ্ট ওয়ায়েয। একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার তাঁকে ওয়ায-নসীহত করতে বারণ করে দেন। তিনি ডাক্তারকে বলেন, 'কুরআন হাদীসের কথা বলে ওয়ায-নসীহত করা বন্ধ করে দিলে হায়াত বেড়ে যাবে একথা লিখে দিতে পারবেন?' ডাক্তার বললেন, 'এটা কীভাবে সম্ভব!' তিনি বললেন, কুরআন হাদীসের কথা বলতে বলতে একবার ইন্তিকাল করা হাজার সুস্থতার চেয়ে উত্তম। তারপর তিনি ওয়ায-নসীহত করেই চলেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের দোসরা ফেব্রুয়ারী জুম'আর রাতে বাদ মাগরিব তিনি হঠাৎ করে কাকরাইল মসজিদে তাশরীফ আনেন। এ সময় তিনি কাকরাইলের মিম্বরে দীর্ঘ বয়ান করেন। সে বয়ান হতে বাইতুল্লাহর গুরুত্ব সম্পর্কে একটা কথা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ায় পাঠকের খিদমতে পেশ করা হল]

আমি ৬০ (ষাট) বছর যাবৎ কুরআনে পাকের তা'লীম দিয়েছি। এ সুদীর্ঘ সময়েও অনেক আয়াতের মর্ম বুঝতে পারিনি। আলহামদুলিল্লাহ! অবশেষে বাইতুল্লাহ শরীফে হাযিরা দিয়ে সেগুলো বুঝতে পেরেছি।

হযরত মাও. রূহুল কিসমত সাহেব রহ.

[তিনি ছিলেন কাকরাইলের একমাত্র মুরুব্বী যিনি টঙ্গীতে ইজতিমা চালু হওয়ার আগে কাকরাইল মসজিদ-সংলগ্ন রমনা পার্কের ইজতিমায় দ্বিতীয় হযরতজী হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর বয়ানের পর তাশকীলে জীবন চিল্লার জন্য দাঁড়িয়ে যান। নিজেকে কবুল করিয়ে তিনি বর্তমানে প্রায় দশ হাজার সাহাবীসহ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে শায়িত। তাঁর হজ্জ বিষয়ক বয়ানসমূহের অংশবিশেষ এই–]

স্থান: কাকরাইল মসজিদ
তারিখ ২২/০৩/১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
রোজ: জুম'আ-বার, বা'দ মাগরিব

দিল পরিষ্কার করে হজ্জে রওয়ানা করা।

ওখানে গিয়ে দিলের ভিতর যা আছে তা-ই প্রকাশ পাবে। দুনিয়ার মহব্বত থাকলে সেটাও প্রকাশ পাবে। ঝগড়া করার অভ্যাস থাকলে ওখানে গিয়ে আরও বেশি করবে। তাই মেহনত করে করে হজ্জের আগেই দিলকে মাখলুকের ইয়াকীন থেকে এবং সবরকম খারাবী থেকে পরিষ্কার করে যাওয়া।

মেসাল : কূপ হতে মরা বেড়াল না তুলে পানি যতই বেশি তুলবে দুর্গন্ধ বাড়বে।

মক্কা শরীফে যাওয়া আল্লাহর আশিক হয়ে, আর মদীনা শরীফে যাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা'শুক হয়ে।

পাগলের কাপড়-চোপর, খাবার-দাবার, বাস-বাসস্থান কোন কিছুর পরোয়া নেই, কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহর এমন পাগল হয়ে তবেই হজ্জের সফর করতে হবে।

খেজুর ও যমযমের পানি বেশি বেশি খাওয়া। যমযম ছাড়া অন্য পানি পান করার চেষ্টাই না করা। খেজুর খেয়ে খেয়ে শরীরে শক্তি পয়দা করা।

ভালো মানুষ হওয়ার নিয়ত করা। জীবন বদলাবার নিয়ত করা।

হজ্জে যাওয়ার আগে মেহনত করে ঘরে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সুন্নাত তরীকা চালু করতে হবে। সবাইকে আল্লাহর হুকুম ও সুন্নাত তরীকা চালু করার মেহনতে লাগাতে হবে। এ মেহনত করতে করতে হজ্জে যেতে হবে এবং হজ্জের পর ফের আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাওয়ার নিয়ত করতে হবে। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হবেন এবং সালামের জবাব দিবেন। পক্ষান্তরে আমার ঘরে সবকিছু সুন্নাতের খেলাফ, সবাই মিলে নবীজীর সুন্নাতের গলায় ছুরি চালাচ্ছে, ঘরে টিভি, কারবারে সুদ—এমতাবস্থায় সালাম দিলে তিনি গোস্বা হবেন। গোস্বা হয়ে বলবেন, তোর আওলাদ, আত্মীয়-স্বজন আমার তরীকাকে জবাই করছে আর তুই এসেছিস সালাম দিতে?

হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করতে হয় এক বার, কিন্তু শয়তানকে কঙ্কর মারতে হয় তিন বার। মুযদালিফা থেকে গিয়ে একদিন এবং পরে কমপক্ষে আরও দুই দিন। কেন? কারণ, শয়তান শত্রু। এজন্য কঙ্কর মেরে মেরে যিন্দেগী থেকে শয়তানী খাসলত বের করতে হবে।

হজ্জের সফরে রাগ-গোস্বা না করা।

দাওয়াত করে খাওয়ানো।

গাম্ভীর্যের সঙ্গে থাকা। হাসি-তামাশা না করা। নিজের হজ্জ যাতে কবুল হয় এবং অন্যদের হজ্জ যাতে ঠিকমতো হয় তার জন্য ফিকির ও মেহনত করা।

আল্লাহর ঘরের আদব রক্ষা করা। ইতিকাফের নিয়তে আদবের সাথে প্রবেশ করা। ভেতরে দুনিয়াবী কথা না বলা। প্রয়োজনে আস্তে আস্তে ও ইশারায় কথা বলা।

চোখ ও অন্যান্য অঙ্গকে গোনাহ হতে হেফাযত করা।

ফাযায়েলে হজ্জ কিতাব সাথে রাখা। হযরত শিবলী রহ. ও তার মুরীদের ঘটনাটি বেশি বেশি পড়া।

হযরত মাও. আব্দুল কাদির সাহেব রহ.

[হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর ইন্তিকালের পর মাওলানা আব্দুল কাদির সাহেব রহ. বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় তাবলীগ জামাআতের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনিও নিজেকে ভরপুর কবুল করিয়ে জান্নাতুল বাক্বীতে আপন ঠিকানা বানিয়েছেন। ১৯৭৯ সাল হতে আমি তাঁর সোহবতে ধন্য হয়েছি। তিনি ছিলেন ১৯৯৯ সালে আমার প্রথম হজ্জ সফরে মিনা-মুযদালিফা-আরাফায় কাফেলার যিম্মাদার এবং পরবর্তীতে একাধিকবার মদীনা মুনাওয়ারায় আমার মেজবান।

তাঁর সোহবত হতে প্রাপ্ত হজ্জ বিষয়ক বয়ানসমূহের অংশবিশেষ তুলে ধরা হল।]

স্থান: কাকরাইল মসজিদ
তারিখ: ২০/০৩/১৯৯৬
রোজ: বুধবার, বা'দ মাগরিব

রওযা শরীফের জালি দিয়ে উঁকি মারা বে-আদবী। ওখানে শুধু সালাম দেয়া ও শাফায়াত চাওয়া। হাত তুলে দু'আ না করা। তৃতীয় হযরতজী রহ., মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহ., মুফতী যয়নুল আবেদীন সাহেব রহ., বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব রহ. এঁদের কেউই রওজা শরীফের সামনে হাত তুলে দু'আ করেননি। যতদিন থাকা হয় দৈনিক কমপক্ষে ১/২ বার যিয়ারত করা। সুযোগ হলে একটু দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ৭০ (সত্তর) বার সালাম দেয়া।

স্থান: মিনা, মক্কা মুকাররমা
তারিখ: ১৩/১২/১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ৩০/০৩/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
রোজ : মঙ্গলবার, সকাল

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে আসেন তারা সবাই আল্লাহর দাওয়াতী মেহমান। আল্লাহ স্বয়ং তাদের মেজবান। তিনি মেহমানদারী করবেন তাঁর শান মোতাবেক। সেই মেহমানদারী কী? হজ্জের ব্যাপারে যত ফাযায়েল আছে সব আল্লাহর পক্ষ হতে মেহমানদারী।

যেমন :

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه.

(অর্থ:) যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করল, তাতে কোন অশ্লীল কাজ ও নাফরমানী করেনি, সে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় (গুনাহমুক্ত অবস্থায়) হজ্জ থেকে ফিরল। (সহীহ বুখারী, হা. নং ১৫২১)

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة.

(অর্থ:) কবুল হজ্জের প্রতিদান হল একমাত্র জান্নাত। (সহীহ বুখারী, হা. নং ১৭৭২)

الحاج يشفع من اهل بيته وفى اربعمأة من عشيرته.

(অর্থ:) একজন [মাবরূর] হজ্জকারী নিজ পরিবারের জন্য ও আত্মীয়দের থেকে চারশত জনের জন্য সুপারিশ করবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা. নং ৮৫৮২)

অতএব, হজ্জ হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজী করার নিয়তে এবং হতে হবে বিলকুল গুনাহমুক্ত।

[মুনাজাত : আল্লাহ তা'আলা হজ্জ বিষয়ক এ লেখাটি দয়ামায়া করে কবুল করে নিন। হেদায়াতপ্রাপ্তদের মতো আমলের তাওফীক দান করুন। উভয় জগতে কামিয়াব করুন— আমাকে, পাঠককে, রাবেতা পরিবারকে, আমাদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রসহ কেয়ামত পর্যন্ত নসলকে। আর জাযায়ে খায়ের দান করুন যাঁদের সোহবত হতে এ লেখা সংকলিত হয়েছে তাঁদেরকে এবং আল্লাহর সে সকল বান্দাকে যারা আমার এ দু'আর উপর বলবে আ-মী-ন।]

(বি.দ্র. আয়াত ও হাদীসসমূহের ইবারত, অনুবাদ এবং হাওয়ালা বয়ানলেখকের বড় সাহেবযাদা [ফাযেলে রাহমানিয়া] মুফতী আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম কর্তৃক সংযোজিত)

আ ত্ম জী ব নী

*দারুল উলূম করাচির মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা এখন থেকে ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করবে। অনুবাদ করেছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, দারুল উলূম করাচির ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত **মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী**।*

ইয়াদেঁ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(পূর্বপ্রকাশের পর)

ভাইজান হযরত মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.-এর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা ছাড়া কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের সব ভাইদের মধ্যে এই গৌরব এককভাবে ভাইজানেরই ছিলো যে, তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর খেদমত, সোহবত এবং বাই'আতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আব্বাজান রহ. প্রতি বছর তাঁকে সঙ্গে করে থানাভবন নিয়ে যেতেন। হযরত থানবী রহ.-ও ভাইজানকে সীমাহীন মহব্বত করতেন। বহুবার তিনি ভাইজানকে তাঁর মাথা মালিশের সুযোগ দিয়েছেন। হযরত থানবী রহ. পান খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না; তবে কখনো খাওয়া-দাওয়া শেষে চুন-সুপারি ছাড়া শুধু পানপাতাটা গ্রহণ করতেন। বেশিরভাগ ভাইজানই নির্ধারিত সময়ে হযরতের খেদমতে পান পেশ করতেন। তাই হযরত থানবী রহ. রসিকতা করে ভাইজানকে 'পানী' বলে ডাকতেন। [ঠিক যেমন বরফ হাদিয়া দেয়ার কারণে তিনি শায়খুল হাদীস যাকারিয়্যা রহ.-কে 'বরফী' বলে ডাকতেন] হযরতের পানের প্রয়োজনের সময় ভাইজান কাছে না থাকলে তিনি বলতেন–

'ওহে! কোথায় গেলো আমাদের পানী?'

ভাইজানের আরেকটি বড় সৌভাগ্য ছিলো, একদিন তিনি হযরতের কাছে আর্জি করে বসলেন– 'আমাকে পান্দনামা আত্তার পড়িয়ে দিন!'

হযরতের হাতে এতো সময় কোথায় ছিলো যে, তিনি অমন ছোট্ট বাচ্চাকে পান্দনামা পড়িয়ে দিবেন? কিন্তু ভাইজানের প্রতি তাঁর অসামান্য স্নেহ এবং ভাইজানের আগ্রহাতিশয্য দেখে এই নিষ্পাপ আবেদন তিনি ফিরিয়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। তিনি বললেন–

'আমার হাতে তো সময় নেই, তবে আসরের পর কিছু সময় যখন পায়চারির জন্য বেরোই, কিতাব নিয়ে এসো, পড়িয়ে দেবো।'

আসরের পর যথাসময়ে ভাইজান কিতাব হাতে পৌঁছে গেলেন। যথারীতি দরস শুরু হয়ে গেলো। তখন হযরতের বড় বড় খলিফাবৃন্দও থানাভবনে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে তাঁদেরও বড় ঈর্ষা হলো এবং তাঁরাও এই মহতী দরসে উপস্থিতির অনুমতি চাইলেন। হযরতও অনুমতি দিলেন। সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ দরসে উপস্থিত ছিলেন হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব, হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব, হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব এবং হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী সাহেব রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। রমযান ব্যাপী দরস চললো। হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব রহ. অনেক সময় ভাইজানের সঙ্গে এ ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বলতেন– 'তুমি তো আমাদের সহপাঠী। তোমার অবদানে আমাদেরও হযরত থানবী রহ.-এর কাছে পান্দনামা পড়ার গৌরব অর্জন হয়েছে।'

ছোট্টবয়সে ভাইজান সবেমাত্র লিখতে শিখেছেন। আব্বাজান ভাইজানের প্রথম চিঠি হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বরাবর লিখিয়েছেন। চিঠির জবাবে হযরত থানবী রহ. যা বলেছেন, তা আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষণীয় বিষয়, আর ভাইজানের জন্য পরম সৌভাগ্যের সোপান। হযরত লিখেছেন–

'প্রিয়, সাল্লামাহু!

তোমার প্রতি সালাম এবং অনেক অনেক দু'আ রইল। তোমার লেখা দেখে খুশিতে দিল ভরে গেছে। আমি তোমার ইলমী, আমলী উৎকর্ষের জন্য দু'আ করি। লেখাটা আরেকটু পরিচ্ছন্ন করে নিয়ো, যেনো পাঠক সহজেই পড়তে পারেন। এতে তোমার সওয়াবও মিলে যাবে। দেখো! আমি তোমাকে বাল্যকালেই সুফী বানিয়ে দিচ্ছি। আর মাথাব্যথার এই তাবিয মাথায় বেঁধে নিয়ো। ঘরের সবার প্রতি সালাম ও দু'আ রইল।

–আশরাফ আলী'

সাধারণ মানুষ ভাববেন, লেখা পরিচ্ছন্ন করার সঙ্গে তাসাওউফের কী সম্পর্ক? কিন্তু হযরত থানবী রহ.-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি শরীয়ত ও তরীকতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যথা: আদব, মুআশারাত, আখলাক এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি নিজ ভক্তবৃন্দকে সেই সময়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যখন দীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে দীন-বহির্ভূত ধরে নেয়া হয়েছিলো। হযরত কখনোই দৈনন্দিনের ওযীফা-নফলে অলসতার কারণে কাউকে ভর্ৎসনা করেননি। তবে কেউ আদব, মুআমালাত, মুআশারাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে, অথবা অন্যের কষ্ট হয় এমন কোন কাজ করলে এর জন্য অবশ্যই কঠিনভাবে পাকড়াও করতেন।

ভাইজানের উপর হযরতের এই শিক্ষা ও তরবিয়তের প্রভাব এতোটাই ক্রিয়াশীল যে, তিনি সর্বদা নিজের ওঠা-বসায় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, যেন তাঁর দ্বারা কারো কষ্ট না হয়।

হযরত হাকীমুল উম্মতের হাতে ভাইজানের বাই'আতের ঘটনাটিও বড় আশ্চর্যকর! ভাইজান তখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। হযরতের নিঃস্বার্থ স্নেহ ও অনুপম ভালোবাসায় সাহসী হয়ে একদিন তিনি নিজ থেকেই হযরতের কাছে বাই'আতের দরখাস্ত পেশ করলেন। হযরত সাধারণত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বাই'আত করতেন না। তাই স্বভাবজাত খোশমেজাজে বললেন–

'বাই'আত বুঝি খালি হাতে হয়? যাও! পেয়ারা নিয়ে এসো, তবেই বাই'আত করবো!'

তখন পেয়ারার মৌসুম না হওয়ায় তা বাজারেও পাওয়া যেতো না। সম্ভবত ভাইজানের কথা না রাখার জন্যই হযরত এমন নির্দোষ শর্তটি জুড়ে দিয়েছিলেন। হযরতের ধারণা ছিলো, এই বে-মৌসুমে সে পেয়ারা আনতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ভাইজান নাছোড়বান্দা, কোত্থেকে যেনো পেয়ারা নিয়ে এসে হাজির! হযরত তো দেখে বিলকুল তাজ্জব বনে গেলেন! তবে তিনি যেহেতু ওয়াদা করেই ফেলেছিলেন, তাই খুশিখুশি বাই'আত করে নিলেন। কিন্তু হযরতের মতো করে শরয়ী বিধানাবলির প্রতি আর কেই-বা এতোটা লক্ষ্য রাখবে? যেহেতু বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হাদিয়া কবুল করতে ইসলাম অনুমতি দেয় না, তাই তিনি ভাইজানকে এই বলে ফেরত পাঠালেন–

'যাও! আব্বু-আম্মুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো।'

ভাইজান অনুমতি নিয়ে এসেছেন তবেই হযরত হাদিয়া কবুল করেছেন।

এই ঘটনার পর ১৩৫৬ হিজরীর রবিউস সানির সাত তারিখে আব্বাজান রহ. হযরতের কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি লিখেছেন–

'আলহামদুলিল্লাহ্! মুহাম্মদ যাকী (সাল্লামাহু)-এর বাই'আতের বরকত ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন নামাযের প্রতি তার আগ্রহ খুব বেড়ে গেছে। আগে সে ইশার নামাজের পূর্বেই শুয়ে পড়তো। এখন বসে বসে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে।'

হযরত হাকীমুল উম্মত এই পত্রের জবাবে লিখেছেন–

'মাশাআল্লাহ! আমিও দু'আ চাই, আল্লাহ যেনো আমাকেও এই নিষ্পাপ-মাসুম বাচ্চাদের বরকত নসীব করেন এবং আমলের হিম্মত, দৃঢ়তা ও ইখলাস দান করেন।'

শৈশবে ভাইজানের (জনাব যাকী কাইফী) অধিকাংশ বিষয়-আশয় হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর পরামর্শক্রমেই সিদ্ধান্ত হতো। সে ধারাবাহিকতায় ১৩৫৫ হিজরীর ১০ই রজব আব্বাজান হযরত থানবী রহ. বরাবর চিঠি লিখলেন–

'মুহাম্মদ যাকী (সাল্লামাহু) এক বছরের বেশি সময় হলো কুরআনুল কারীমের হিফয শুরু করেছে। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে সে ভীষণরকম অসুখে ভুগছে। এদিকে কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ হল– যাকী কুরআনুল কারীম হিফযের মেহনত বরদাশত করতে পারবে না। এমতাবস্থায় কী করণীয় বুঝে উঠতে পারছি না!'

হযরত থানবী রহ. জবাবে লিখলেন–

'যাকী যদি আমার সন্তান হতো, তবে আপাতত তার হিফয মওকুফ করে দিতাম। পরবর্তীতে সুযোগমত (অর্থাৎ দরসী পড়াশোনা শেষে) বাকিটা পূর্ণ করাতাম। আর তখন তার জন্যও অনেক সহজ হয়ে যেতো।'

এভাবেই ভাইজান আঠারো বছর বয়স অবধি হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা লাভে ধন্য হয়েছেন। সে সময় একবার আব্বাজান রহ.-এর একটি চিঠি হযরত থানবী রহ.-এর কাছে দ্রুত পাঠানোর প্রয়োজন পড়লো। আব্বাজান চাচ্ছিলেন, যে করেই হোক চিঠিটা সে দিনই হযরত থানবীর হাতে পৌঁছে যাক। এদিকে সাহারানপুর থেকে গাড়িতে করে সরাসরি থানাভবন যাওয়া সম্ভবপর ছিলো না। ভাইজান স্বেচ্ছায় এই খেদমতটুকু নিজ যিম্মায় নিয়ে নিলেন। তিনি দেওবন্দ থেকে মুযাফফরনগর হয়ে শামেলী পৌঁছলেন। ভেবেছিলেন, হয়তো শামেলী থেকে থানাভবনের গাড়ী পেয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি শামেলী পৌঁছতে পৌঁছতেই গাড়ী স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ভাইজান ওখান থেকে একটি সাইকেল ভাড়া নিলেন এবং শামেলী থেকে থানাভবন পর্যন্ত দীর্ঘপথ সাইকেলেই অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময়ে হযরত থানবীর হাতে চিঠি পৌঁছে দিলেন।

হযরত থানবী ছাড়াও দেওবন্দের হযরত মিয়াঁজী সাহেব রহ. (হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগর হুসাইন সাহেব) ভাইজানকে অনেক স্নেহ-মহব্বত করতেন। ভাইজানেরও তাঁদের খেদমত করার ও সোহবত ওঠানোর খুব সুযোগ হয়েছে। এমনিতেও ছোট্টবয়স থেকে তিনি বুযুর্গদের ফয়েয লাভ এবং তাঁদের খেদমত ও সোহবত থেকে ফায়দা ওঠানোর জন্য মুখিয়ে থাকতেন।

নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি তো তাঁরই মুখে শোভা পায়–

اس وقت سے میں تیرا پرستار حسن ہوں،
دل کو مرے شعور محبت بھی جب نہ تھا۔

সেই কাঁচা বয়সেই তব রূপে
মজিলাম;
কাকে বলে ভালোবাসা নাহি
জানিতাম!

বুযুর্গদের সোহবতে থেকে ভাইজান দীনদারী এবং দীনী প্রজ্ঞায় নিজেকে এতটাই রাঙিয়ে তুলেছিলেন যে, কখনোই কোন পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছে তিনি নতি স্বীকার করেননি। যেখানে যে পরিবেশেই ছিলেন, সর্বদা দীনের রঙে অন্যকে রাঙিয়েছেন।

# # #

আমার চতুর্থতম বোন ছিলেন হাসিবা খাতুন (রহিমাহাল্লাহ)। আমরা তাঁকে 'বি-জান' বলতাম। আর পঞ্চম নম্বরে ছিলেন, মুহতারামা রাকিবা খাতুন (মাদ্দাযিল্লুহা)। তাঁকে বলতাম ছোট আপা। বয়সে উভয়েই আমার চেয়ে অনেক বড়। তবে তখনো কারোরই বিয়ে হয়নি। শুরু থেকেই তারা আমাকে এতোটাই ঘনিষ্ঠ করে নিয়েছিলেন যে, বয়সের বড় রকমের ব্যবধান সত্ত্বেও সবসময় আমাদের বন্ধন ছিলো বন্ধুত্বের। এই বোনদের শিক্ষা-দীক্ষা বলতে ফুফু উম্মাতুল হান্নান সাহেবার মকতব এবং ঘরে বেহেশতী যেওর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আব্বাজানের তালীম-তরবিয়তের ফলে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্যানুরাগ নিঃসন্দেহে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিলো। তাঁদের ব্যক্তিগত অধ্যয়নের ব্যাপ্তিও ছিলো অনেক। শুধু দুর্বোধ্য মর্ম উপলব্ধির অসাধারণ দক্ষতাই নয়, তাঁরা নিজেরাই উচ্চাঙ্গের শের ও কবিতা রচনা করতেন। নমুনা স্বরূপ বড়বোন মুহতারামা হাসিবা খাতুনের এই শ্লোক দু'টো দেখুন–

ہمیں تو آتا ہے رونا مآل گلشن پر،
بھلا یہ ہنستے ہیں کیوں گلستاں نہیں معلوم۔
মালী কাঁদে বাগান লয়ে শেষ কী হবে তায়!
বাগান হাসে নির্ভাবনায় বোঝা বড় দায়!
گزر رہی ہیں نشیمن سے بے سلام وپیام،
خفا خفا سی ہیں کیوں بجلیاں نہیں معلوم۔
বলা-কওয়া ছাড়াই হঠাৎ আসর ছেড়ে ধায়;
কোন্ সে হেতু নারায সেটা ভেবে পাওয়াই দায়!

এবং মুহতারামা রাকিবা খাতুন সাহেবার নিম্নোক্ত শ্লোক–

ضبط غم بھی ڈبڈبا ہی گی،
آنکھ دل سے شکست کھا ہی گی۔
আঁখিজলে ভেসে ওঠে হৃদয়ের ভার,
পোড়াচোখ শেষতক্ মেনে নেয় হার!
سنتے سنتے مرا فسانۂ غم،
چاند تاروں کو نیند آ ہی گی۔
দুঃখের পাঁচালী শুনে শুনে মোর;
চাঁদ-তারাদেরও চোখে ঘুমঘোর!

সেই ছোট্টবয়সে আমার অধিকাংশ সময় তাদের সাথেই কাটতো। আমার কাপড় পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে যত্তোসব মান-অভিমান আর বায়নাক্কা পূরণে তারা বাধ্য থাকতেন। তাদের সাহচর্য বাল্যকালেই আমার মাঝে সাহিত্যের বীজ বপন করে দিয়েছিলো।

# # #

আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে ষষ্ঠতম ছিলেন জনাব মুহাম্মদ রাযী উসমানী সাহেব রাহিমাহুল্লাহ। দেওবন্দে থাকাকালীন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ফার্সী বিভাগে পড়তেন। ছোটদের প্রতি ছিলো তাঁর বিস্ময়কর স্নেহ ও ভালোবাসা। ছোটদের কচিমনে লুকোছাপা বাসনা-আবদার তিনি খুব করে বুঝতে পারতেন। আমাকে তিনি যেন সবসময় মাথায় তুলে রাখতেন এবং আমার ইচ্ছে পূরণে যথেষ্ট তৎপর থাকতেন। আমরা ছোট তিনভাই তাঁকে 'ভাই রাযী' বলে ডাকতাম। আর আমি আমার আধো-আধো বোলে ডাকতাম–'ভাই লাজি'। তবে তিনি কখনো আমার ইচ্ছে পূরণে ব্যর্থ হলে, মনের ক্ষোভ মেটানোর জন্য 'ভাই' শব্দটা বাদ দিয়ে সরাসরি নাম ধরে রাগত কণ্ঠে বলতাম–'লাজি'!

একবার তিনি বুঝতে পারলেন কবুতর দেখে আমি খুব আনন্দ পাই। তাঁর এক বন্ধু, হযরতুল আল্লাম শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর ভাতিজা, শখের বশে কবুতর পালতেন। সম্ভবত আমার আগ্রহাতিশয্য দেখেই ভাইজান তাঁকে বলেছিলেন, আমার জন্যও যেন একজোড়া কবুতর নিয়ে আসেন। সেমতে তিনি একদিন কবুতর হাতে আমাদের দরজায় কড়া নাড়লেন। ভাই সাহেব আমাকে সাথে নিয়ে দরজায় খুললেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম কবুতর দু'টো আমার জন্যই আনা হয়েছে, তখন আমার খুশি যেন আর ধরে না! শিশুকালের সেই খুশির কথা আজও আমি ভুলতে পারি না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভাইজানকে ক্ষমার চাদরে আবৃত রাখুন। তিনি নিজেও তখন অল্পবয়সী ছিলেন। কখনো কখনো আমাকে খুশি করার মানসে কাগজে-কলমে ছবি আঁকতেন। একবার তিনি আমাকে একটা কাগজে পেয়ারা, লেবু, চড়ুই, গাধা ও কাকের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। কিভাবে যেন আমি জানতে পেরেছিলাম, প্রাণীর ছবি দেখে আব্বাজান নারায হবেন। এরই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে যখনই আমি কোন কারণে জেদ করতাম, ভাঙা-ভাঙা বোলে তার নাম ধরে বলতাম–

املود، نیموں، چلیا، ددھا، توا.

শুদ্ধ উচ্চারণ-

امرود، لیموں، چڑیا، گدھا، کوا.

সম্ভবত এভাবে বলার সাথে একরকম হুমকি-ধমকিরও একটা ব্যাপার থাকতো যে, আপনি যদি আমাকে নারায করেন তাহলে আপনি যে চড়ুই, গাধা আর কাকের ছবি এঁকেছেন তা আমি আব্বাকে বলে দেবো! একপর্যায়ে তো এটা আমার গালিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। এরপর শুধু ভাইজানকেই নয়, বরং যেই আমাকে নারায করতো তাকেই আমি রাগের সুরে বলতাম–

'আমলুদ, নেম্মু, চলয়া, দাদ্ধা, তাউয়া।'

এগুলোই ছিলো আমার সবচে' নিকৃষ্ট গালি। ছোটবেলায় কারো সঙ্গে আমার ঝগড়া-বিবাদ হলে তাকে এগুলো শোনাতাম।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভাইজানকে আপন ক্ষমা ও সন্তুষ্টির চাদরে ঢেকে নিন।

আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহের একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত–

হযরত আব্বাজান রহ.-কে শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.-এর স্থানে বুখারী শরীফ পড়ানোর জন্য দারুল উলূম ডাভেলে আহ্বান জানানো হয়েছিলো। আব্বাজান ভাইজানকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক মাস ডাভেলে ছিলেন। সে সময় তিনি আমার শূন্যতায় সবসময় ভারাক্রান্ত থাকতেন। আল-বালাগ-এ আব্বাজান রহ.-এর জীবনবৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন–

'অধম সে সময় কুরআনুল কারীম নাযেরা পড়তাম এবং সেখানেই (দারুল উলূম ডাভেল, ভারত) নাযেরা বিভাগে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। ক্লাস ছুটিকালীন বেশিরভাগ চুপচাপ থাকতাম। খাবার-দাবারসহ কোনো কাজেই নূন্যতম মন বসতো না। এর মূল কারণ ছিলো এখনকার আল-বালাগ সম্পাদক এই মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী। তখন তিনি দুই বা আড়াই বছর বয়সী ছিলেন। তাঁর প্রতি অধমের এতোটাই স্নেহ, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো যে, দেওবন্দ থাকাকালীনও তাঁর মুহূর্তের বিচ্ছেদ আমার জন্য অসম্ভব ছিলো। কাজেই বলাবাহুল্য ডাভেলেও তাঁকে ক্ষণেক্ষণে খুব মনে পড়তো। তাঁর বিরহজ্বালা সইতে না পেরে মাদরাসার দরজায়-দেয়ালে যত্রতত্র তাঁর নাম লিখে বিচ্ছেদকাতর মনকে কিছুটা প্রবোধ দিতাম।' (আল-বালাগ, মুফতিয়ে আযম সংখ্যা)

ভাইজানের একটি বড় ত্যাগ ছিলো এই– পাকিস্তান হিজরতের পর আমরা সব ভাই ছোট ছিলাম। বার্ধক্যবশত আব্বাজানও ব্যবসায়ী কাজ দেখভাল করতে সক্ষম ছিলেন না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা শেষে তিনি আব্বাজানের কুতুবখানা দারুল ইশাআতের পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়ে সেটা দেখভালের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছিলেন। এ কারণে তার নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা-দীক্ষা আর এগোয়নি। তবে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন-অনুরাগ আল্লাহর ফযলে জীবনের

শেষ প্রহর পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। পাশাপাশি আমলের দিক থেকেও তিনি অনেকের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। হারামাইন শরীফাইনে হাজির হওয়ার জন্য যারপরনাই উদগ্রীব থাকতেন। প্রায় প্রতিবছর সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে সেখানে হাজির হতেন।

# # #

আমার ভাই-বোনের সপ্তম নম্বরে হলেন জনাব মুহাম্মদ ওলী রাযী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহু। দেওবন্দে থাকাকালীন তিনি দারুল উলূমের হিফয বিভাগে পড়তেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিস্ময়কর ধী-শক্তি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দান করেছেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক আচরণের অধিকারী। যখন কাব্য-সাহিত্যের ময়দানে পা রেখেছেন তো এক অনন্য কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শিক্ষকতার পেশায় এসেছেন তো করাচী গ্রামার স্কুল এবং করাচী ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনাকালীন বে-হিসাব লোকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ইংলিশে এম.এ (মাস্টার্স) ডিগ্রিধারী আমার এ ভাইটি বিভিন্ন দীনী কিতাবের ইংরেজি অনুবাদেরও খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আমার লেখা 'বাইবেল সে কুরআন তক্' এবং 'উম্মাতে মুসলিমা কা মাওকিফ' [কাদিয়ানীদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান] কিতাব দু'টির ইংরেজি অনুবাদ তার হাত ধরেই হয়েছে। আল-বালাগের ইংরেজি সংখ্যা আজ অবধি তারই ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হচ্ছে। তার অনন্য মেধা ও মননশীলতার জ্বলন্ত উদাহরণ তার লেখা 'হাদিয়ে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' শীর্ষক সীরাতগ্রন্থ। এখন তো এটি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থে তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনবৃত্তান্ত নুকতাবিহীন হরফে (বিন্দুবিহীন বর্ণে) লিখেছেন। ভাবা যায়, প্রায় চারশো পৃষ্ঠা ব্যাপী এই সীরাতগ্রন্থের পুরোটাই নুকতাশূন্য?!!

এটি এমন এক অনুপম রচনা, যদি বিশ্বরেকর্ড বলি, ভুল হবে না। উর্দূভাষায় শুধুমাত্র নুকতাবিহীন হরফবিশিষ্ট শব্দাবলী ব্যবহার করে এবং নুকতাওয়ালা হরফবিশিষ্ট শব্দাবলী পরিহার করে কোন দীর্ঘ রচনা প্রস্তুত করা, বিশেষত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত লেখা যে কতোটা দুর্বোধ্য ও প্রায় অসাধ্য ব্যাপার, তা আমি এই কিতাবের ভূমিকায় সবিস্তার বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলার কৃপায় তিনি মাত্র কয়েকমাসে এই অসাধ্য সাধন করে রেকর্ড গড়েছেন। এছাড়াও তার লেখা আরো অনেক কিতাব, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কলাম রয়েছে, যেগুলো তার ব্যক্তিগত অধ্যয়ন এবং ইলমী, দীনী ও সাহিত্যরুচির প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে যেন বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক বানিয়েছেন। খ্যাতির মোহ উপেক্ষা করে তিনি আজ অবধি লেখালেখির মাধ্যমে দীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

# # #

অষ্টম নম্বরে আমার বড়ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহু। বয়সে তিনি আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বাল্যকাল থেকে আজ অবধি এমন অঙ্গাঙ্গী করে জড়িয়ে রেখেছেন যে, শুধু ঘরোয়া পরিবেশেই নয়; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমাদের দু'জনের নাম ওতপ্রোতভাবে নেয়া হয়। সকল ভাই-বোনদের মধ্যে আমার সবচে' বেশি ওঠা-বসার সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গেই হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই শিখেছি। তবে আমার স্বভাবজাত জীবনযাপন তদানুসারে আমলের ক্ষেত্রে কখনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। তিনি অত্যধিক পরিপাটি ও সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী। অথচ আমি অনুভূতিশূন্য ও অগোছালো। তিনি সবকাজে ধীরস্থির, আর আমি তাড়াহুড়োকারী। তাঁর বাসা থেকে অফিস পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস সুবিন্যস্ত, আর আমার সব কিছু অবিন্যস্ত। মোটকথা আমার সকল নির্বুদ্ধিতাকে তিনি যেভাবে সয়েছেন ও প্রশ্রয় দিয়েছেন এটা তারই কৃতিত্ব। তবিয়তের ভিন্নতার দরুন আমার সকল প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়াবলী অবশ্যই আমার অগোছালো জীবনযাপনের কারণেই ছিলো। তবুও কখনো এগুলো তাঁর ধৈর্যে-সহ্যে উল্লেখযোগ্য বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেনি। এ ব্যাপারে সব কৃতিত্বই তাঁর। আলহামদুলিল্লাহ্! শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে শিক্ষকতা, ইফতা এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজেও ওতপ্রোতভাবে আমি তাঁর সঙ্গ পেয়েছি এবং সবসময় তাঁর আপত্য স্নেহ ও মায়া-মমতায় সিক্ত হয়েছি।

হযরত মুফতী ওলী হাসান রহ.-এর পর উলামায়ে কেরাম তাঁকে 'মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান' উপাধি দিয়েছেন। উর্দূ, আরবী ভাষায় রচিত তাঁর কালজয়ী গ্রন্থাবলী, তাঁর লেখা ফতোয়াসমূহ এবং তাঁর মনোমুগ্ধকর পাঠদানশৈলী, তাঁর স্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী ও ভারসাম্যপূর্ণ ভাষণ ও ওয়ায-নসীহত এই উপাধির যথার্থতার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আজ যদি পাকিস্তানে বিচক্ষণ, ন্যায়নিষ্ঠ চিন্তাবিদ, সাহেবুর রায় (পরিণামদর্শী) মুতাদিল (মধ্যপন্থী) এবং মুখলিস উলামায়ে কেরামের তালিকা তৈরি হয়, আলহামদুলিল্লাহ্! তাঁর নাম সর্বশীর্ষে স্থান পায়। দারুল উলূম করাচির নির্মাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তিনি যেভাবে নিজের শারীরিক, মানসিক শক্তি-সামর্থ্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন, আজ দারুল উলূমের প্রতিটি দোর-দেয়াল এবং প্রতিটি চড়াই-উৎরাই তার নীরব সাক্ষী। যদি বলি–দারুল উলূমের এক-দু'টি ছাড়া সমস্ত ভবন তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে এবং এর প্রতিটি ইট-পাথরে মিশে আছে তাঁর ঘাম তবে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘ করুন এবং তাঁকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন। তিনি শুধু আমার জন্যই নয়, বরং আমাদের পুরো খান্দান এবং দারুল উলূমের জন্য একজন মমতাময় পিতার ভূমিকা রাখেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর বহুমুখী সেবা ও অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

কুরবানী বিষয়ক কিছু ভুল-ভ্রান্তি

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ সাইম

হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার নিকট কুরবানীর দিনগুলোতে পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় ইবাদত আর নেই। কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের বিনিময়ে কুরবানীদাতাকে সওয়াব প্রদান করা হয়। একটা পশুর শরীরে কী পরিমাণ লোম থাকে তা গণনা করা এবং সংখ্যায় ব্যক্ত করা তো প্রায়-অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এমন সওয়াবসমৃদ্ধ ইবাদতও কুরবানীদাতার কিছু ভুল চেতনা ও ভুল কর্মপন্থার কারণে বিলকুল সওয়াবশূন্য হয়ে যায় কিংবা নিদেনপক্ষে সওয়াব হ্রাস পায়। এ নিবন্ধে তেমনই কিছু ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করা হবে, যেন কুরবানীদাতাগণ সেগুলো পরিহার করে কুরবানীর পরিপূর্ণ সওয়াব হাসিল করতে পারেন।

আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল-বিভ্রান্তি

কুরবানীর মান ও পরিমাণ সামর্থ্য অনুপাতে হওয়া উচিত :

আধুনিক শিক্ষিত একশ্রেণীর লোক আছে–অঢেল সম্পদের মালিক। বিভিন্ন ছুতানাতায় দু'-চারটা খাশি-গরু কেটে লোকজনকে খাইয়ে দেয়। কিন্তু কুরবানীর সময় আসলে অজানা এক কারণে এদের অর্থবিত্তের ঘাটতি দেখা দেয়। নানা অজুহাতে একটা দুইটা ছাগল কুরবানী দিয়েই এরা দায় সারে। এতে কুরবানীর ওয়াজিব দায়িত্ব তো আদায় হবে কিন্তু কুরবাণীর প্রতি তার আত্মিক আকর্ষণ প্রমাণহীন রয়ে যাবে। বস্তুত কুরবানীর মান ও পরিমাণ নিজ নিজ সামর্থ্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

কুরবানীব্যয় সংকোচন করে দারিদ্র্যবিমোচন :

আরেক শ্রেণীর লোক আছে, যারা একাধিক কুরবানী দেয়াকে অপচয় মনে করে। তারা একটা ছাগলের মাধ্যমে দায়িত্ব সেরে এই খাতের বাকি টাকা গরীব-দুঃখীদের দারিদ্র্যবিমোচনের অন্যান্য খাতে ব্যয় করার পক্ষপাতি। মনে রাখতে হবে, কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীর সহযোগিতা করাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। কুরবানীর জন্য নিয়তকৃত বরাদ্দ সংকোচন করে অন্য পন্থায় গরীব-দুঃখীর সহযোগিতা করার এ মানসিকতা শরীয়তের রুচিসম্মত নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে মানবদরদী আর কে হতে পারে? অথচ তিনি বিদায় হজ্জে নিজের পক্ষ হতে ১০০ (একশত) উট কুরবানী করেছেন। তিনি তো পারতেন, একটি উট কুরবানী করে বাকিগুলো গরীবদেরকে দান করে দিতে, কিংবা সেগুলোর টাকা দারিদ্র্যবিমোচন খাতে ব্যয় করতে! তাছাড়া তখন তো মানুষের আর্থিক অনটন এ যুগের চেয়ে বহুগুণে প্রকট ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। বোঝা গেল, তথাকথিত দারিদ্র্য-বিমোচনের নামে কুরবানীব্যয় সংকোচনের সুযোগ নেই। উপরন্তু কুরবানী বলুন, আর সাধারণ দান সব কিছু তো আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্যই হয়ে থাকে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা যে সময় যে পদ্ধতির দানে নিজ সন্তুষ্টির কথা তার রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তার রাসূলও তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মত হিসেবে সে সময় সে পদ্ধতিতেই দান করা উচিত। কুযুক্তির আশ্রয় নেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ জাতীয় মানসিকতার ধারকগণ একদিকে দারিদ্র্যবিমোচনের অজুহাতে কুরবানীব্যয় সংকোচন করে, অপরদিকে দারিদ্র্যবিমোচনেও তারা ঠনঠনে। পক্ষান্তরে যারা দিল খোলাসা করে উদার মনে বেশি সংখ্যায় কুরবানী করে তারা দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচিতেও অধিক তৎপর।

মনের পশুরে করো জবাই (?) :

আরেক শ্রেণীর লোক আছে, যারা স্বয়ং কুরবানী করাকেই অপছন্দ করে। এদের মুখরোচক শ্লোগান হল, 'মনের পশুরে করো জবাই।' এরা বলতে চায়, মনের কুরিপু দমনের উদ্দেশে পশুর গলায় ছুরি চালানো অনর্থক। কেননা দোষ-ত্রুটি করবে মানুষ আর জের বইবে নিরপরাধ পশু এটা অযৌক্তিক। এই শ্রেণীটি মূলত বর্ণচোরা। আসলে কুরবানীর প্রতি নয়, এদের আপত্তি স্বয়ং ইসলামের প্রতি; বরং বিধানদাতা আল্লাহর প্রতি। এদের এ কর্মপন্থা ইসলামের প্রতি তাদের সংশয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। উপরন্তু তাদের এ যুক্তিটিও কুযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। কেননা কুরিপু অর্থাৎ আত্মার পশুত্ব দমন এটি শুধু কুরবানী নয়, সকল ইবাদতেরই অন্যতম একটি লক্ষ্য। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যে ইবাদত যে পন্থায় পালন করার আদেশ দিয়েছেন কায়মনোবাক্যে সে ইবাদত সে পন্থায় পালন করলেই মনের পশু দুর্বল হতে থাকে এবং একসময় জবাই হয়ে যায়। উদাহরণত আল্লাহ তা'আলা নামাযের আদেশ দিয়েছেন তার যিকর হাসিলের জন্য। এর মর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার কাছে নামাযের মাধ্যমে অর্জিত বা নামাযসংশ্লিষ্ট বিশেষ যিকির কামনা করেছেন। নামায ছাড়া অন্য কোন পন্থায় উক্ত যিকির হাসিল হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এখন কেউ যদি বলে, নামাযের উদ্দেশ্য যেহেতু যিকির কাজেই নামায না পড়ে সুবাহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়লেই তো হয়; নামায পড়ার দরকার কী? তাহলে এই লোকের কথা ঠিক তেমনই ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য হবে যেমন ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য হবে ঐ কর্মচারীর কর্মপন্থা, যাকে তার মালিক প্রিয় বন্ধুর বাড়িতে 'বনফুল'-এর দশকেজি মিষ্টি হাদিয়া নিয়ে যেতে বলল, আর 'যুক্তিবাদী' কর্মচারী 'মিষ্টিও মিষ্টি, চিনিও মিষ্টি, উপরন্তু চিনি সহজলভ্য' এই কুযুক্তি দাঁড় করিয়ে মিষ্টির পরিবর্তে দশকেজি চিনি নিয়ে হাজির হল। সন্দেহ নেই এ কর্মচারী যতই যুক্তি পেশ করুক–মালিকের চড়-থাপ্পর সে খাবেই। আর রগচটা মালিক হলে তো চড়-থাপ্পরেই থামবে না, যুক্তিবাদী সাহেবকে তারই ফর্মুলায় চিনি গিলতে বাধ্য করবে যে, 'মিষ্টিও মিষ্টি, চিনিও মিষ্টি' তাহলে মিষ্টির মতো করে পানি ছাড়াই কেজিখানেক চিনি গিলে খা'। কুরবানীর ক্ষেত্রেও একই কথা। ইসলাম পশুর গলায় ছুরি চালানোর মাধ্যমে আত্মাকে আল্লাহর প্রতি বিনীত করার আদেশ দিয়েছে। অন্য কোন পন্থায় অর্জিত বিনয় কুরবানীর মাধ্যমে অর্জিত বিনয়ের সমতুল্য বা বিকল্প কোনটিই হতে পারে না।

অদ্ভুত পশুপ্রেম :

পরিবেশবাদী ও পশু সংরক্ষণবাদীরা যদিও বাহ্যিকভাবে সব দেশে, সব সময় ও সব ধরণের পশুহত্যা বা জবাইয়ের ঘোর বিরোধী কিন্তু স্বভাববক্রতা হেতু

ইসলামের বিধান কুরবানীর প্রতিই তাদের অ্যালার্জি বেশি। তাদের দাবী–পশুহত্যা বা পশুজবাই পশুর প্রতি জুলুম এবং এটা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। কিন্তু এই অতিজ্ঞানীরা ভেবেই দেখেনি, বড় ও সবল প্রাণী কর্তৃক ছোট ও দুর্বল প্রাণীকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করা প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতিতে বড় মাছ ছোট মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বাঘ-সিংহ অন্যান্য প্রাণীকে শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক এই খাদ্যচক্র যদি কোনভাবে ব্যাহত হয়, অব্যাহত না থাকে তাহলে প্রকৃতি ও পরিবেশে বড় ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তদ্রুপ মানুষও প্রকৃতির অংশ। মানুষকেও তার চাহিদা মেটাতে অন্যান্য প্রাণী থেকে আমিষ সংগ্রহ করতে হয় এবং এটাই প্রাকৃতিক বিধান। ভাবুন তো, যদি সারা বছর, নিদেনপক্ষে কুরবানীর সময়টিতেই ওদের এই কুযুক্তি অবলম্বন করে জবাই, কুরবানী বন্ধ রাখা হয় এবং এ অবস্থা ১০ বছরকাল চলতে থাকে তাহলে মিলিয়ন-বিলিয়ন গরু-ছাগলের ভারে ও অত্যাচারে পৃথিবীতে কী দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হবে! গরু-ছাগলের খাদ্য যোগাড় করতে এবং তাদের সুরক্ষা দিতে শেষতক্ মানুষকে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে হবে না? একবার অষ্ট্রেলিয়ায় আইন করে খরগোশ শিকার বন্ধ রাখা হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে বাসা-বাড়িতে, ক্ষেতে-খামারে খরগোশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শুধু সাধারণ জনগণই নয় সরকারীভাবে খরগোশনিধন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছিল। তাছাড়া এই যে পশুপ্রেমীর দল, বড় অদ্ভুত এদের পশুপ্রেম! আফ্রিকার গহীন অরণ্যে কোন্ প্রজাতির পিঁপড়া বিলুপ্তির পথে তার জন্য এরা বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট খুলে বসে। কিন্তু তাদের ফাদার-ব্রাদাররা পৃথিবীর দেশে দেশে বোমা ফেলে লক্ষ-কোটি বনী আদমকে মেরে সাফ করে ফেললেও এদেরকে নামকাওয়াস্তে কিছু প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু করতে দেখা যায় না। মানবপ্রেমের তুলনায় যাদের অন্তরে পশুপ্রেম বেশি তাদের 'পাশবিক' চিন্তাভাবনা পৃথিবীকে আর কতদিন যে জ্বালিয়ে মারবে তার ইয়ত্তা নেই!

ইসলামী জবাই বনাম পশ্চিমা সিবিপি পদ্ধতি :

আরেক শ্রেণীর লোক বিশেষত পশ্চিমারা ইসলামী জবাই পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর বলে প্রচারণা চালায়। তারা মাথায় ইলেক্ট্রিক শক-এর মাধ্যমে পশুটিকে অজ্ঞান করে তারপর কাটাকাটির পক্ষপাতি। এতে নাকি পশুর কষ্ট কম হয়। তাদের এই কল্পিত নিষ্ঠুরতা এবং কল্পিত আরাম প্রদানকে আধুনিক গবেষণা কিন্তু নাকচ করে দিয়েছে। জার্মানীর হ্যানোভার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ভেটেরিনারী মেডিসিনের অধ্যাপক শুলৎজ এবং তার সহকর্মী ড. হাজিম- "Attempts to objetify pain and consciousness in conventional captive bolt pistol stunning and ritual halal kanife methods of slaughtering sheep and calves." শীর্ষক গবেষণাকর্মে পাশ্চাত্যের প্রচলিত পদ্ধতি এবং ইসলামী রীতিতে পশু জবাইয়ের বিবিধ দিক তুলে ধরেন। গবেষণালব্ধ ফলাফলে তারা দেখিয়েছেন, পশু জবাইয়ের হলাল পদ্ধতিই সবচেয়ে মানবিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। বরং পাশ্চাত্যে প্রচলিত CBP (Captive bolt pistol) stunning পদ্ধতি প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে পশুর মৃত্যু ঘটায়। এ গবেষণায় তারা ছোট অপারেশন করে পশুগুলোর মস্তিষ্কে মগজ স্পর্শ করে কয়েকটি বৈদ্যুতিক তারের প্রান্ত (Electrode) স্থাপন করেন। অপারেশনের পর পরীক্ষাধীন পশুগুলোকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে কয়েকদিন সময় দেয়া হয়। এরপর কিছু পশুকে ইসলামী রীতিতে জবাই করা হয়, অর্থাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুত গলার শিরাসমূহ (জুগুলার ভেইন ও ক্যারোটিভ আর্টারী) সেই সঙ্গে শ্বাসনালী (ট্রাকিয়া) ও খাদ্যনালী (Oesophagus) কেটে ফেলা হয়। তবে স্পাইনাল কর্ড অক্ষত রাখা হয়। বাকি পশুগুলোকে ক্যাপটিভ বোল্ট পিস্তল (CBP) দিয়ে অজ্ঞান (Stan) করে মৃত্যু ঘটানো হয়। সব পশুরই এই মৃত্যু প্রক্রিয়ার সময় ব্রেনের ইইজি ও হার্টের ইসিজি রেকর্ড করা হয়। ফলাফলে দেখা যায় :

ইসলামী জবাই পদ্ধতিতে–

(ক) জবাইয়ের পর প্রথম তিন সেকেণ্ডের ইইজিতে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। অর্থাৎ জবাইয়ের প্রক্রিয়াকালীন বা তাৎক্ষণিক পরবর্তী মুহূর্তে পশুটি কোনো রকম ব্যথা অনুভব করেনি।

(খ) পরবর্তী তিন সেকেণ্ডে ইইজি গ্রাফ দেখে বোঝা যায়, পশুটি গভীর ঘুমে বা অবচেতনে চলে গেছে। শরীর থেকে বিপুল পরিমাণ রক্ত বের হওয়ার কারণে পশুটি অবচেতন হয়ে যায়। উপরে উল্লিখিত ছয় সেকেণ্ড অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা যায়, ইইজির রেখাটি জিরো লেভেলে চলে এসেছে। অর্থাৎ পশুটি তখন ব্যথা-বেদনা অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে। এ অবস্থায়ও দেখা যায়, হৃৎপিণ্ড তখনও সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে এবং সমস্ত শরীর প্রচণ্ডভাবে দাপাদাপি করছে। অঙ্গগুলোর এই নড়াচড়ার কারণে শরীর থেকে বেশির ভাগ রক্ত গলার কাটা পথে বের হয়ে যায়, যা সঠিক স্বাস্থ্যসম্মত হালাল গোশতের মান নিশ্চিত করে।

পাশ্চাত্যের সিবিপি স্ট্যানিং পদ্ধতিতে–

(ক) স্ট্যানিংয়ের পরপর পশুটিকে আপাতদৃষ্টিতে অজ্ঞান মনে হয়।

(খ) ইইজি গ্রাফে স্ট্যানিংয়ের পরপর প্রচণ্ড যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা যায়।

(গ) হৃপিণ্ড ইসলামী পদ্ধতিতে জবাইয়ের তুলনায় অনেক আগে থেমে যায়। ফলে শরীরের মধ্যে রক্ত জমাট বেধে যায় এবং এর ফলে এই পশুর গোশত তুলনামূলক ততটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

এছাড়া টেক্সাসের এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার ফুড ইন্সপেকশন এজেন্সি পরিচালিত গবেষণায় আরও ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। পাশ্চাত্যে প্রচলিত নিউমেটিক স্ট্যানিং পদ্ধতিতে মৃত্যু ঘটানো পশুর গোশত মানুষের মধ্যে 'ম্যাডকাউ ডিজিজ' ছড়ানোর জন্য দায়ী বলে তারা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, অন্য কোন গবেষণা যদি উল্লিখিত গবেষণাকে ভুলও আখ্যায়িত করে তবুও আল্লাহর বান্দা হিসেবে একজন মুসলমান কিছুতেই জবাই পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর মনে করতে পারে না।

নিয়ত প্রসঙ্গ

নিয়তের পরিশুদ্ধি :

সকল কাজের সওয়াব ও প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন, নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণ এবং নির্দিষ্ট সওয়াব অর্জনের নিয়তেই কুরবানী করতে হবে। কুরবানী না দিলে গোশত খাবে কোত্থেকে, আত্মীয়-স্বজনই-বা কী বলবে, সন্তানেরা অন্যের হাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে, চেয়ারম্যান মানুষ–বড়টা না দিলে ইজ্জত থাকবে না, ছেলে বিয়ে করিয়েছি, মেয়ে বিয়ে দিয়েছি–বেয়াই বাড়িয়ে গোশত না পাঠালে মান বাঁচবে না– এ জাতীয় লোক দেখানো নিয়ত কুরবানীর সওয়াব বিনষ্ট করে দেয়।

আনন্দচিত্তে কুরবানী করা, ঝামেলা মনে না করা :

পূর্ণ সওয়াব পেতে হলে বরং অধিক সওয়াব লাভ করতে হলে নিয়তের পরিশুদ্ধির পাশাপাশি কুরবানীদাতার আন্তরিক সন্তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততাও কাম্য।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী করার উপদেশ দিয়েছেন। অনেক কুরবানীদাতা নিয়ত তো পরিশুদ্ধ রাখে কিন্তু কুরবানীর বিধানকে একপ্রকার চাপ মনে করে। মনে হয়, নিতান্ত ঠেকায় পড়েই তাকে কুরবানী করতে হচ্ছে। কখনও কখনও উচ্চারণেও তা প্রকাশ পায়– 'ইস্ কতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল! কুরবানী দেয়া না লাগলে তো এগুলো অন্য কাজে ব্যয় করা যেতো।' অবশ্য কারও কারও উচ্চারণ আরেকটু হালকা হয়; পাওনাদার অথবা সাহায্যপ্রার্থী আসলে বলে– 'ভাই! সামনে কুরবানীর 'ঝামেলা' আছে, নতুন করে ঝামেলা বাড়াবেন না।' ইবাদতকে ঝামেলা মনে করা কিংবা ঝামেলা শব্দে ব্যক্ত করা কোনটিই সমীচীন নয়। এতে ইবাদতের প্রতিদান হ্রাস পায়।

হালাল সম্পদ দ্বারা কুরবানী করা

কুরবানীর পশু হালাল মাল দ্বারা ক্রয় করা আবশ্যক। হারাম মাল দ্বারা কৃত ইবাদত আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। কুরবানী একটি মহান ইবাদত এবং এটিকে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সুমহান আল্লাহর দরবারে কবুল করাতে হবে– এ অনুভূতি যার নেই সাধারণত তারাই কুরবানীর খাতে হারাম মাল ব্যয় করার দুঃসাহস করে।

শরীকানা কুরবানীদাতাদের খেয়াল রাখা উচিত, কুরবানীতে ব্যবহৃত নিজ সম্পদ হালাল হওয়ার পাশাপাশি শরীকদের সম্পদও যেন হালাল হয়। শরীকদের একজনের টাকা হারাম হলে অন্যান্যদের কুরবানীও বানচাল হয়ে যায়। এজন্য নিজেও হারাম মাল নিয়ে কারও কুরবানীতে শরীক হবে না এবং কোন শরীকের উপার্জন হারাম হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হলে তাকেও শরীক বানাবে না।

কুরবানীর পশুর সঙ্গে সদাচরণ

কুরবানীর পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে পশুর হৃষ্টপুষ্টতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যও বিবেচনা করা উচিত। দামদস্তুরের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া ঠিক আছে, কিন্তু ঠকা-জেতার মনোভাবকে প্রাধান্য না দেয়া উচিত। পশুর সঙ্গে মহব্বত পয়দা করা উচিত। সাধ্য অনুযায়ী তার খাদ্যপানীয় ও অবস্থানের ভালো ব্যবস্থা করা উচিত। কুরবানীর পশুকে অহেতুক কষ্ট দেয়া দুর্ভাগ্যের আলামত। মনে রাখতে হবে, এই পশুটি তো কুরবানীদাতার পুত্রের প্রাণের বদলা। আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন অনুগ্রহ করে পুত্রের স্থলে পশু জবাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সেদিন যদি পুত্রের কুরবানী মঞ্জুর হয়ে যেতো এবং সেটিকে পরবর্তীদের জন্য বিধান সাব্যস্ত করা হতো তাহলে আজ পরিস্থিতি কী দাঁড়াতো! তাহলে পুত্রের স্থলে নিজেকে কুরবান করা পশুটিকে অহেতুক কষ্ট দেয়া, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার আরামের ব্যবস্থা না করা নিঃসন্দেহে অকৃতজ্ঞতা।

অনুরূপভাবে পশুটিকে আরাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জবাই করার আগেই (পশুর সামনে নয়) ছুরিটিকে খুব ধার দিয়ে নিতে হবে। ভোঁতা ছুরিতে জবাই করা বিলকুল নিষেধ। অনেক সময় জবাই করার সময়ও পশুর সঙ্গে অসদাচরণ করা হয়। একবার দেখেছি, পশুটিকে বাগে আনার জন্য 'কসাই সাহেব' পশুর চোখে নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ঢুকিয়ে চেপে ধরে রেখেছেন! অনেক সময় পশুটিকে শোয়ানোর জন্য ঘাড় মটকে দেয়া হয়, জবাই করার পর পশু সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই চামড়া ছিলা শুরু করা হয়, লেজ ধরে সজোরে টেনে অসাড় করে দেয়া হয়। এগুলো পাশবিক আচরণ, মানবিক নয়। এ ধরণের কাজে মানুষের সঙ্গে পশুর তেমন পার্থক্য থাকে না।

গোশত বণ্টন

কুরবানীর গোশত এক ভাগ নিজে রাখা, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেয়া এবং এক ভাগ গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেয়া উত্তম। অবশ্য পুরোটা নিজে রাখাও বৈধ আছে, তবে উত্তম নয়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে কুরবানীর গোশতের তিনভাগের এক ভাগ সমাজে দিয়ে দেয়া হয়, আর গরীব-দুঃখীরা আসলে 'সমাজে দিয়ে দিয়েছি' বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সমাজের মাধ্যমে গোশত বণ্টনের নিয়ম বহু কারণে উলামায়ে কেরাম পরিহার করতে বলেছেন। তার মধ্যে উল্লিখিত কারণও একটি।

কুরবানীর গোশত নিজ উদ্যোগে গরীব-দুঃখীর ঘরে পৌঁছে দেয়া উচিত। অনেকে হাজার হাজার লোক জড়ো করে বিশৃঙ্খলভাবে গোশত বণ্টন করে। এতে লোকদেখানো প্রবণতাই বেশি কাজ করে। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় বিলি-বণ্টনের ক্ষেত্রে পদদলিত হয়ে গোশত সংগ্রহকারীর মৃত্যুর ঘটনাও পত্রিকায় এসেছে।

চামড়া দান

কুরবানীর পশুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে কুরবানীদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারে, সরাসরিও দান করতে পারে, আবার বিক্রিও করে দিতে পারে। নিজে বিক্রি না করে সরাসরি দান করে দেয়া উত্তম। তবে নিজে বিক্রি করলে বিক্রয়মূল্য অবশ্যই সদকা করে দিতে হবে; নিজে ব্যবহার করতে পারবে না। দীনী প্রতিষ্ঠানের গরীব তালিবে ইলমকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে চামড়াটি সরাসরি দান করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। এতে দানের পাশাপাশি দীনী খিদমতের সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব লাভ হবে। আমাদের উপমহাদেশে দীনী ইলমের গরীব তালিবে ইলমদের সিংহভাগ ব্যয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কুরবানীর চামড়া হতেই সংগ্রহ করে থাকে। এই জায়গাটিতে এসে অনেকে ভুল করেন। মাদরাসার পক্ষ হতে তালিবে ইলমরা চামড়া দানের আবেদন করলে কেউ তো তাদের সঙ্গে ভিক্ষুকসুলভ আচরণ করে, আর কেউ আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার ওয়ায শুনিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, যে সকল তালিবে ইলম চামড়া সংগ্রহে যান তাদের সবাই কিন্তু গরীব নয়। তাদের বড় একটা অংশের পিতা-মাতা বিত্তশালী এবং তারা বড়মাপের কুরবানীও দেন। শুধুমাত্র দীনের স্বার্থে, গরীব সহপাঠিদের খেদমতের নিয়তে এবং কুরবানীদাতার পশুর চামড়াটি অধিক সওয়াবের খাতে ব্যয়িত হোক এই নেক নিয়তে তারা এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গরীব-ধনী যা-ই হোক, তারা তো আমার হিতাকাঙ্ক্ষার জন্যই আমার কাছে এসেছেন। উচিত তো ছিল, তাদেরকে স্বাগত ও মুবারকবাদ জানানো। তা না করে উল্টো তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করা হলে সেটা হবে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করার নামান্তর। মনে রাখতে হবে, কুরবানীর পশুর চামড়াটি এসব প্রতিষ্ঠানে না দেয়ার কারণে যদি দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমার পিঠের চামড়াটিও হয়তো অক্ষত থাকবে না। দ্বিতীয়ত আত্মীয়-স্বজন কি শুধু কুরবানীর চামড়ায় হকদার? শুধু যাকাত-ফিতরা আর কুরবানীর চামড়ার প্রসঙ্গ আসলেই আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করা কি আত্মীয়তা রক্ষার একমাত্র ও যথার্থ উপায়? এ শ্রেণীর দানের পরিবর্তে সাধারণ দান গ্রহণ করে কি আত্মীয়-স্বজনগণ নিজেকে বেশি সম্মানিত মনে করেন না? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের সঠিক চেতনা ও বিশুদ্ধ রুচি দান করুন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(ক) সন্তান কর্তৃক মৃত কিংবা জীবিত পিতা-মাতার পক্ষ হতে কুরবানী করা, তদ্রুপ উম্মত হিসেবে নবীজীর পক্ষ হতে কুরবানী করতে পারা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব তার কুরবানী আদায় হওয়ার জন্য অবশ্যই তার নিজ নামেও কুরবানী করতে হবে। অনেকে আবেগবশত কিংবা মাসআলা না জানার কারণে নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় না করে মাতা-পিতা বা নবীজীর নামে কুরবানী করে। এতে সওয়াব তো হবে, কিন্তু নিজের কুরবানী অনাদায়ী থাকার কারণে গুনাহও হবে। কেউ এমনটি করে থাকলে এবং কুরবানীর সময় (১০ই যিলহজ্জ ঈদের নামাযের পর হতে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত) তখনও বাকি থাকলে অবশ্যই নিজের পক্ষ হতেও কুরবানী করে নিবে। আর কুরবানীর দিনগুলো পার হয়ে গেলে কমপক্ষে একটি ছাগল জবাই করে গরীব-মিসকীনকে সদকা করে দিবে।

(খ) মূল জবাইকারী কর্তৃক পশুর খাদ্যনালী, শ্বাসনালী ও বড় দুটো রক্তনালীর মধ্য হতে যে কোন তিনটি কাটার পূর্বেই যারা জবাই কাজে ছুরি চালানোর মাধ্যমে মূল জবাইকারীর সহযোগী হয় তাদেরকেও বিসমিল্লাহ বলতে হবে। অবশ্য যারা পা-লেজ ধরে সহযোগিতা করে তাদেরকে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না। অনেক সময় দেখা যায়, মূল জবাইকারী বা সহযোগী ছুরি চালানেওয়ালা বিসমিল্লাহ পড়ে না, বরং পড়তে থাকে অন্যান্য সহযোগীরা–এদের বিসমিল্লাহ বলা ধর্তব্য হবে না।

(গ) কোন কোন এলাকায় পশু জবাইয়ের পর প্রচণ্ডবেগে বের হওয়া রক্ত সংগ্রহ করে ফলবান গাছের গোড়ায় দেয়া হয়, এতে নাকি গাছের ফলন বাড়ে–শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

(ঘ) কুরবানীর পশুর প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্বি বিক্রি করা জায়েয আছে। কিন্তু এর মূল্য পুরোটাই গরীব-মিসকীনকে সদকা করে দিতে হবে। তদ্রুপ যে রশি বা মালাসহ কুরবানীর পশু ক্রয় করা হয় সেগুলোরও একই বিধান। নিজে সরাসরি ব্যবহার করা যাবে, কাউকে হাদিয়াও দেয়া যাবে, কিন্তু বিক্রি করা যাবে না। করলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

(ঙ) কুরবানীর গোশত কাটার জন্য নিযুক্ত কসাইকে বিনিময় হিসেবে চামড়া, গোশত ইত্যাদি দেয়া যাবে না। অর্থাৎ গোশত-চামড়া দিবে এ কারণে মজুরীতে কোন প্রভাব পড়তে পারবে না। চুক্তিকৃত বিনিময় প্রদানের পর হাদিয়া হিসেবে গোশত দিতে অসুবিধা নেই।

তদ্রুপ যে সব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী গোশত কাটার কাজে অংশগ্রহণ করে তাদেরকেও পারিশ্রমিক দিতে হবে। পারিশ্রমিক দিলাম এটা বলে দেয়া জরুরী নয়, হাদিয়া বলেও দেয়া যাবে। কেউ নিতে না চাইলে ভিন্ন কথা। তবে পারিশ্রমিক নেয়নি বলে তার গোশতের ভাগটি বড় হতে পারবে না। হ্যাঁ, আত্মীয় বা প্রতিবেশী হিসেবে সে গোশত না কাটলেও তাকে যে পরিমাণ বেশি দেয়া হতো সে পরিমাণ বেশি দিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু মুশকিল হয় তখন, যখন এসব লোক পারিশ্রমিকের কথা তুললে গোস্বা হয়, আবার বেশি পরিমাণ গোশত নেয়ারও মতলবে থাকে। অনেক সময় এদের জন্য আলাদা করে বড় আকারের ভাগাও দেয়া হয়। এ সমস্যার সমাধানে কুরবানী যে নিছক একটা সামাজিক বিষয় নয়, বড় মাপের একটা ইবাদত এবং এখানে জায়েয-নাজায়েয পর্যায়ের কিছু নিয়ম-কানুনও মেনে চলতে হয়–তাদেরকে মহব্বতের সাথে একথা বুঝিয়ে ৩০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা হাদিয়া দিলে এবং আত্মীয় বা প্রতিবেশী হিসেবে কিছু গোশত বেশি দিলে আশা করা যায় তারাও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। অগত্যা মেনে না নিলে শরীয়তের খাতিরে কুরবানীদাতাকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে এবং এ জাতীয় লোকজনকে কাজে লাগানো যাবে না।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ।
ইমাম ও খতীব, বছিলা বড় মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৭ পৃষ্ঠার পর; কিতাবুল হজ্জ)

উমরার আলোচনা

উমরার হুকুম : যার সামর্থ্য আছে তার জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। অনেকে উমরাকে ওয়াজিবও বলেছেন। (মানাসিক পৃ. ৪৬৩)

উমরার সময় : উমরার জন্য কোনো নির্ধারিত সময় নেই। বছরের যে কোনো সময়ই উমরা করা যায়। তবে ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ ই যিলহজ্জ-এর মধ্যে উমরা করা মাকরূহ। কারণ, এ সময় হজ্জের কার্যক্রম চলতে থাকে। (মানাসিক পৃ. ৪৬৪)

উমরার উত্তম সময় : উমরার জন্য উত্তম সময় হলো রমযান মাস। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'রমযান মাসে উমরা করলে হজ্জের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'রমযান মাসে উমরা করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করার মত ছাওয়াব পাওয়া যায়।' (সহীহ বুখারী হা. নং ১৭৮২, সহীহ মুসলিম হা. নং ১২৫৬)

উমরার ফরয দুইটি : ১. ইহরাম বাঁধা ২. তাওয়াফ করা।

উমরার ওয়াজিবও দুইটি : ১. সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ২. মাথা মুণ্ডানো বা সমস্ত চুল ছোট করা। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলা।

উমরার প্রথম ফরয (প্রথম কাজ) ইহরামের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, তাই এখন শুধু দ্বিতীয় ফরয (উমরার দ্বিতীয় কাজ) তাওয়াফের আলোচনা করা হচ্ছে।

তাওয়াফের প্রস্তুতি : তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা জরুরী। সুতরাং উযূ না থাকলে উযূ করে নিবে, আর গোসল ফরয হলে গোসল করে নিবে। তাওয়াফের স্থানে যেতে হলে মসজিদে হারামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তাই মসজিদে হারামে প্রবেশের পূর্বেই (বাসা, হোটেল বা মসজিদে হারামের বাইরের চত্বরের উযূখানা থেকে) উযূ-গোসল সেরে নিতে হবে। কাপড় বা শরীরে নাপাকি থাকলে পাক করে নিতে হবে। বাহ্যিক নাপাকিসহ তাওয়াফ করা মাকরূহ। মহিলারা হায়েয-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না। (গুনইয়াতুন নাসিক পৃ. ১২২)

মসজিদে হারামে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা

* পবিত্রতা অর্জনের পর প্রথমে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলো যথা নিয়মে পালন করবে। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলবে, দুরূদ শরীফ পড়বে, এরপর মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়বে। বিসমিল্লাহ, দুরূদ শরীফ ও দু'আ একত্রে এভাবে পড়া যায় :

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

তারপর ডান পা মসজিদের সীমানায় রাখবে এবং মসজিদে প্রবেশ করে ই'তিকাফের নিয়ত করে নিবে।

* মসজিদে হারামে প্রবেশের পর বাইতুল্লাহর উপর প্রথমবার নজর পড়ার সাথে সাথে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এরপর একবার বা তিনবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে। অনন্তর প্রাণখুলে দু'আ করবে। এই সময় দু'আ কবূল হয়। এই দু'আর সময় হাত না উঠানো ভালো। (মানাসিক পৃ. ১২৮,৫৬৪)

মসজিদুল হারাম সম্পর্কীয় বিবিধ মাসাইল

* মক্কায় অবস্থানকালে মসজিদে হারামেই নামায পড়ার চেষ্টা করবে। কারণ,

মসজিদে হারামে নামায পড়লে প্রতি রাকআতে এক লক্ষ রাকআতের নেকী পাওয়া যায়। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ হা. নং ৫৮৫৮)

* মসজিদে হারামে যেখানেই নামায পড়া হোক নামায অবস্থায় সীনা একেবারে কাবা শরীফ বরাবর থাকা জরুরী। সীনা কাবা শরীফ বরাবর না থাকলে নামায হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ১/৩১২)

* মসজিদে হারামে জামাআতে নামায পড়ার সময় মহিলার পাশে বা সরাসরি মহিলার পিছনে নামায আদায় করবে না। তবে নামায অবস্থায় যদি কোনো মাহিলা পাশে দাঁড়িয়ে নামাযে শরীক হয়ে যায়, তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হবে না। (সূরা বাকারা-২৮৬)

* বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও সাওয়াবের কাজ। তাই ইশক-মহব্বতের সাথে গুনাহ মাফের আশায় বেশি-বেশি তাকিয়ে থাকবে।

* মসজিদে প্রবেশের পর কোনো প্রয়েজনে বাইরে যেতে হলে জায়নামায বা অন্য কিছু রেখে জায়গা দখল করে যাবে না কিংবা কারো সাহায্যে জায়গা ধরে রাখবে না। মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আসারও চেষ্টা করবে না। বরং উযূ-ইস্তিঞ্জা সেরে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই বসে পড়বে। যে কোনোভাবে অন্যকে কষ্ট দেয়া গুনাহের কাজ। এই পবিত্র স্থানে সব ধরণের গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। তাই কাউকে কষ্ট দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না।

*মসজিদে তিলাওয়াত, নামায ও যিকিরে মশগুল থাকবে। গল্প করবে না এবং উচ্চ স্বরে কথাও বলবে না।

তালবিয়া বন্ধ: হজ্জে তামাত্তুকারীগণ উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধার আগে আর তালবিয়া পড়ার অনুমতি নেই।

তাওয়াফ: মসজিদে হারাম অতিক্রম করার পর তাওয়াফের স্থান শুরু হয়। তাওয়াফের স্থানকে মাতাফ বলে। মাতাফে পৌঁছে তাওয়াফ করবে। তাওয়াফ শুরু করার আগে ইজতিবা করে নিবে। ইজতিবা হল, গায়ে জড়ানো কাপড়টি ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দেয়া। অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রাখা। যে তাওয়াফের পর সাঈ করতে হয় (যেমন: উমরার তাওয়াফ, তাওয়াফে কুদূম, তাওয়াফে যিয়ারাত) সেই তাওয়াফের মধ্যে ইজতিবা করা সুন্নাত। সম্পূর্ণ তাওয়াফে ইজতিবা অবস্থায় থাকা সুন্নাত। নফল তাওয়াফে ইজতিবা নেই। ইজতিবার হুকুম পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নয়। (মানাসিক পৃ. ১৩০)

* তাওয়াফ শুরু করার আগে হাজারে আসওয়াদের বরাবর দাঁড়িয়ে তার দিকে সীনা ও চেহারা ফিরিয়ে দাঁড়াবে।

তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা: *ভিড়ের মধ্যে হাজারে আসওয়াদ বরাবর আসতে পেরেছে কিনা তা বুঝার সহজ উপায় হল, মসজিদে হারামের এক দিকে শুধু একটি মিনার আছে, সেই মিনার থেকে একটু সামনে অগ্রসর হবে। কিংবা ঐ দিকেই মসজিদে হারামের দ্বিতীয় তলায় সবুজ বাতি জ্বলে থাকতে দেখবে। ঐ বাতি বরাবর দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহমুখী হলেই হাজারে আসওয়াদ বরাবর হয়ে যাবে।*

* হাজারে আসওয়াদ বরাবর এসে তাওয়াফের নিয়ত করবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি উমরার তাওয়াফ করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন। অনন্তর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার মত করে হাত উঠিয়ে بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ বলে ছেড়ে দিবে।

*এরপর بسْم الله اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلهَ اِلاَّاللهُ وِلِلّهِ اَلْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْل لله. বলে কিংবা শুধু بسْم الله اَللهُ اَكْبَرُ বলে হাজারে আসওয়াদে চুমু খাবে। (মানাসিক পৃ. ১৩০)

উল্লেখ্য, ইশারার মাধ্যমে হাজারে আসওয়াদ চুমু খাওয়া ভালো ও নিরাপদ। ইশারায় চুমু খাওয়ার পদ্ধতি হল, হাজারে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে উভয় হাতের তালু হাজারে আসওয়াদের উপর রাখার মতো করে ইশারা করা। অতঃপর হাতের তালুতে শব্দ করা ছাড়া চুমু খাওয়া।

আজকাল ভিড়ের কারণে যেহেতু হাজারে আসওয়াদের কাছে যাওয়া যায় না, তাছাড়া ওখানে খোশবু লাগানো থাকে, তাই ইশারায় হাজারে আসওয়াদ চুমু খাওয়াই ভালো। তবে কেউ যদি কখনো হাজারে আসওয়াদকে সরাসরি চুমু খাওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে হাজারে আসওয়াদের উপর দুই হাত রেখে দুই হাতের মাঝে পাথরের উপর নিঃশব্দে চুমু খাবে। যদি এভাবে চুমু খেতে না পারে তাহলে সম্ভব হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুমু খাবে। (মানাসিক পৃ. ১৩১)

* হাজারে আসওয়াদ চুম্বন শেষে সিনা সোজা করে কাবা শরীফকে বামে রেখে বীরদর্পে হাঁটতে শুরু করবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। রমল হল, কাঁধ হেলিয়ে একটু দ্রুত ও বীরদর্পে হাঁটা। যে তাওয়াফের পর সাঈ থাকে সে তাওয়াফের মধ্যে রমলও করতে হয়। উমরার তাওয়াফের পর যেহেতু সাঈ আছে তাই উমরার তাওয়াফে রমল করতে হবে। পুরুষদের জন্য তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। মহিলারা রমল করবে না। প্রচণ্ড ভিড়ের সময় রমল করার দ্বারা অন্যের কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে রমল বন্ধ রাখবে, স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। অনন্তর প্রথম তিন চক্করের মধ্যে সুযোগ পেলে রমল করবে। অন্যথায় করতে হবে না। (মানাসিক পৃ. ১৩৩)

* তাওয়াফ করা অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফেরানো নিষেধ। তখন কোনো কারণে বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফিরে গেলে, যতটুকু স্থান সীনা ফেরানো অবস্থায় তাওয়াফ করা হয়েছে ততটুকু স্থান পুনরায় সহীহভাবে তাওয়াফ করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪)

* পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করতে অক্ষম ব্যক্তি হুইল চেয়ার বা অন্য কোনো বাহনে চড়ে তাওয়াফ করতে পারবে। (মানাসিক পৃ. ১৫২)

* তাওয়াফের সময় ফরয নামায বা জানাযা নামাযের জামাআত শুরু হলে তাওয়াফ স্থগিত করে জামাআতে শরীক হবে। নামায শেষে যেখানে তাওয়াফ স্থগিত করা হয়েছিলো সেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করবে। তবে বিরতির আগে তিন চক্কর বা তার চেয়ে কম তাওয়াফ করে থাকলে এই চক্করগুলো না ধরে নতুন করে তাওয়াফ শুরু করা উত্তম। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৭)

* তাওয়াফের সময় বাইতুল্লাহর দিকে ইচ্ছা করে তাকানো মাকরূহ। (আনওয়ারে মানাসিক পৃ. ৩৭৬)

* সাত চক্করে এক তাওয়াফ পূর্ণ হয়। এক তাওয়াফে স্বেচ্ছায় সাতের অধিক চক্কর দেয়া নিষেধ। যদি কেউ স্বেচ্ছায় সাতের অধিক চক্কর দেয়, তাহলে অষ্টম চক্কর নতুন তাওয়াফ বলে গণ্য হবে এবং তাকে ঐ অতিরিক্ত চক্করসহ সাত চক্কর পুরা করতে হবে। তবে ভুলবশত সাতের অধিক হয়ে গেলে অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৬)

* রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে সম্ভব হলে দুই হাত বা শুধু ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে। সম্ভব না হলে করবে না। রুকনে ইয়ামানীকে ইশারায় স্পর্শ করার কোনো বিধান নেই। (বাইতুল্লাহর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ রুকনে ইয়ামানী। এই কোণের নিচের দিকে কাবা শরীফের কিছু অংশ গেলাফমুক্ত রাখা হয়েছে।) রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে গিয়ে যদি সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তাহলে ঐ স্থানটুকুর তাওয়াফ পুনরায় করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮)

* হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হবে। হাজারে আসওয়াদের বরাবর পৌঁছে তার দিকে

ফিরে দাঁড়াবে। এর পর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে সম্ভব হলে সরাসরি অন্যথায় ইশারায় হাজারে আসওয়াদকে চুমু খাবে। অনন্তর বাইতুল্লাহকে বামে রেখে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবে। আগের নিয়ম অনুযায়ী চক্কর পুরা করবে। এভাবে সাত চক্করে এক তাওয়াফ হবে। খেয়াল রাখবে, তাওয়াফের সাত চক্করে আটবার হাজারে আসওয়াদ চুমু খেতে হবে। তাওয়াফ শুরু করার সময় একবার আর প্রত্যেক চক্কর শেষে একবার। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮)

* তাওয়াফ করাকালীন প্রয়োজনে পানি পান করা যাবে। (মানাসিক পৃ. ১৬৪)

* তাওয়াফের সময় যদিও কথাবার্তা বলা জায়েয, কিন্তু একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলবে না। যিকির ও দু'আর মধ্যে মশগুল থাকবে। তাওয়াফ অবস্থায় কিতাব দেখে কোনো দু'আ পড়ার প্রয়োজন নেই। তাওয়াফের মধ্যে এমন কোনো নির্দিষ্ট দু'আ নেই যা না পড়লে তাওয়াফ সহীহ হবে না। তাওয়াফের সময় যে কোনো দু'আ ও যিকির করা যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াফ অবস্থায় দুই স্থানে দু'টি দু'আ পড়ার কথা বর্ণিত আছে। যারা পারবে তারা ঐ দুই স্থানে দু'আ দু'টি পড়বে। যথা:

ক. রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি এই দু'আ পড়তেন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ৩০২৪৮)

খ. হাজারে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে এই দু'আ পড়তেন:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِيْ فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِيْ بِخَيْرٍ.

'হে আল্লাহ! আপনার প্রদত্ত রিযিকে আমায় তুষ্ট রাখুন এবং তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর আমার যাবতীয় অজ্ঞাত বিষয়াদিতে কল্যাণ নিহিত রাখুন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হা.নং ৩০২৪৯)

অভিজ্ঞতা: *এমন কিছু যিকির আছে যেগুলো তাওয়াফের সময় আদায় করলে যিকিরের আমলও হয়ে যাবে সাথে সাথে কত চক্কর হল এবং এখন কততম চক্কর চলছে তা-ও মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তবে এগুলোকে সুন্নাত মনে করবে না, শুধু বৈধ মনে করবে। যিকিরগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:*

১ম চক্করে سُبْحَانَ اللهِ *পড়তে থাকা।*

২য় চক্করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *পড়তে থাকা।*

৩য় চক্করে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ *পড়তে থাকা।*

৪র্থ চক্করে اَللهُ اَكْبَرُ *পড়তে থাকা।*

৫ম চক্করে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم *পড়তে থাকা।*

৬ষ্ঠ চক্করে যে কোনো সহীহ দুরূদ শরীফ পড়তে থাকা।

৭ম চক্করে যে কোনো ইস্তিগফার পড়তে থাকা।

উল্লেখ্য, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাওয়াফ অবস্থায় পড়ার দু'আ দু'টি নির্দিষ্ট দুই স্থানে পড়বে। আর অন্যান্য স্থানে এই যিকিরগুলো করবে। তাহলে দু'আ-যিকির উভয়টির উপর আমল করা হবে এবং চক্করের নম্বরও মনে থাকবে। এছাড়াও তাওয়াফ অবস্থায় প্রত্যেকে মনের আবেগ ও প্রয়োজন মোতাবেক নিজ ভাষায় যে কোনো দু'আই করতে পারবে। স্মরণ রাখবে, তাওয়াফ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা থেকে যিকির করা উত্তম। (আনওয়ারে মানাসিক পৃ. ৩৮২)

তাওয়াফ শেষে করণীয়: প্রথমে ইযতিবা খুলে ফেলবে। অর্থাৎ ডান বগলের নিচ থেকে কাপড় বের করে ডান কাঁধ ঢেকে নেবে। কারণ, তাওয়াফ ছাড়া অন্যস্থানে ইযতিবা করা নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৫)

* তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকআত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায পড়তে হবে। তাওয়াফ নফল, ওয়াজিব, ফরয যা-ই হোক শেষ করে দুই রাকআত নামায পড়া ওয়াজিব। এই দুই রাকআত নামায মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়া মুস্তাহাব। তাওয়াফের স্থান ছেড়ে মাতাফের এক কোণে এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে মাকামে ইবরাহীম এবং বাইতুল্লাহ উভয়টি সামনে থাকে। যদি এভাবে দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে হারামের সীমানার মধ্যে যে কোনো জায়গায় এই নামায আদায় করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৮)

* মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এই দুই রাকআত নামায তাওয়াফ শেষ করে সাথে সাথে আদায় করে নেয়া উত্তম। (মানাসিক পৃ. ১৫৫)

* এই দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। তবে অন্য কোনো সূরা দিয়েও তা আদায় করা যাবে। (মানাসিক পৃ. ১৫৭)

* আসরের পর তাওয়াফ করলে তাওয়াফের নামায মাগরিবের ফরযের পর সুন্নাতের আগে পড়বে। (মানাসিক পৃ. ১৫৭)

* তাওয়াফের নামায শেষে দু'আ করবে। এখন দু'আ কবূলের সময়। তাই প্রাণ খুলে দু'আ করবে।

* নামায শেষে পেট ভরে তৃপ্তিসহকারে যমযমের পানি পান করবে। নামায শেষে এই মুবারক পানি পান করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে কিংবা বসে যেভাবে সম্ভব পান করা যাবে। পান করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর এই দু'আ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقًا وَاسِعاً وشِفَاءً مِنْ كُل دَاء.

পান শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে। (মানাসিক পৃ. ১৩৯)

যমযমের পানি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা: *মাতাফের বিভিন্ন জায়গায় যমযমের পানির পাত্র (জার) রাখা আছে। কিছু পাত্রের গায়ে Not cold (নট কোল্ড) লেখা আছে। সেগুলো স্বাভাবিক পানি। আর অধিকাংশ পাত্রের গায়ে কিছু লেখা নেই। সেগুলো ঠাণ্ডা পানি। যেটা স্বাস্থ্যের অনুকূলে হবে সেটা তৃপ্তিসহ পান করবে। তাওয়াফ থেকে ফারেগ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই পানির চাহিদা সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'আলারও হুকুম পানি পান করা। এভাবে পরম করুণাময় আল্লাহ বান্দার স্বভাবচাহিদাকে ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন।*

মুলতাযামে উপস্থিতি: হাজারে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী দেয়ালকে মুলতাযাম বলে। যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। মুলতাযামে এসে বাইতুল্লাহর দেয়ালের সাথে বুক ও ডান গাল লাগিয়ে দিবে এবং ডান হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বাইতুল্লাহকে জড়িয়ে ধরবে। তাকবীর ও দুরূদ শরীফ পড়ে কেঁদে কেঁদে খুব দু'আ করবে। এখানে দু'আ কবূল হয়। তবে বেশি শব্দ করে কাঁদবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯)

সাঈর আলোচনা

উমরার তৃতীয় কাজ তাওয়াফের পরে সাঈ করা। সাঈ করা ওয়াজিব।

সাঈর প্রস্তুতি: 'সাঈ' হল, 'সাফা-মারওয়া' এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার চক্কর দেয়া। সাফা থেকে সাঈ শুরু করে মারওয়াতে পৌঁছলে এক চক্কর হবে। এরপর মারওয়া থেকে সাফায় আসলে দ্বিতীয় চক্কর হবে। এভাবে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দেয়াকে সাঈ বলে। সাঈ শুরু হবে সাফা থেকে আর শেষ হবে মারওয়ায়।

* তাওয়াফের পর দেরি না করে সাঈ করে নেয়া সুন্নাত। অবশ্য ওযরের কারণে দেরি হলে কোনো সমস্যা নেই। (মানাসিক পৃ. ১৭০)

* উযূ অবস্থায় সাঈ করা এবং সাঈর সময় কাপড় পবিত্র থাকা মুস্তাহাব। মহিলাদের জন্য হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় সাঈ করা সুন্নাত। গোসল ফরয হলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সাঈ করা সুন্নাত। (মানাসিক পৃ. ১৮০)

সাঈ শুরু করার পূর্বে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা: সাঈর কার্যাদি শুরু করার পূর্বে সাঈর নিয়ত করবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে: 'হে আল্লাহ! আমি সাঈ করার ইচ্ছা করছি তুমি তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কবূল করে নাও।'

এরপর তাওয়াফ শুরু করার সময় যেভাবে ইশারার মাধ্যমে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা হয়েছিল সেভাবে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করবে। সাঈ শুরু করার পূর্বে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব। (মানাসিক পৃ. ১৪০)

* এরপর মসজিদে হারামের 'বাবুস্সাফা' দিয়ে সাফা পাহাড়ে উঠবে। সাঈর জন্য সাফা বা মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার প্রয়োজন নেই; বরং ৭/৮ হাত উপরে ওঠাই যথেষ্ট।

সাঈর পদ্ধতি: সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহমুখী হয়ে দাঁড়াবে। সম্ভব হলে সেখান থেকে কাবা শরীফ দেখার চেষ্টা করবে। এরপর দু'আর জন্য হাত উঠাবে। তিনবার তাকবীর (اَللّٰهُ اَكْبَر) ও তাহমীদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) পড়বে। এরপর তাহলীল তথা لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। এখানে দু'আ কবূল হয়। (মানাসিক পৃ. ১৭১-১৭২)

* সাফা পাহাড়ে আরোহণের সময় এ আয়াতটি পড়বে–

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

* এরপর ডান দিকের রাস্তা ধরে স্বাভাবিকভাবে মারওয়া পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করবে। সাফা-মারওয়ার মাঝে যে স্থানে সবুজ বাতি জ্বলে আছে, সেই স্থানে পুরুষদের জন্য খুব দ্রুত হাঁটা মুস্তাহাব। মহিলারা এখানেও স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। (মানাসিক পৃ. ১৭২)

* সাঈ করার সময় বিশেষত যে স্থানটুকু জুড়ে সবুজ বাতি জ্বলে আছে, সেই স্থান অতিক্রম করার সময় সম্ভব হলে এই দু'আ পড়বে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ.

(মানাসিক পৃ. ১৭২)

* মারওয়ায় পৌঁছে কাতারের দাগ দেখে কেবলা নির্ধারণ করে এক কিনারে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এখানেও হাত তুলে দু'আ করবে। সাফা পাহাড়ে যেসব যিকির বা দু'আ করা হয়েছিলো মারওয়াতেও সেগুলো করবে। এখানেও দু'আ কবূল হয়। সাফা থেকে মারওয়ায় আসার মাধ্যমে সাঈর এক চক্কর পূর্ণ হলো। (মানাসিক পৃ. ১৭৩)

* মারওয়া থেকে আবার সাফায় গেলে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হবে। প্রত্যেক বার সাফা-মারওয়ায় উঠে যিকির ও দু'আ করবে এবং সবুজ বাতিযুক্ত স্থানে দ্রুত হাঁটবে। এভাবে সাত চক্কর পুরা করবে। সপ্তম চক্কর মারওয়ায় শেষ হবে। (মানাসিক পৃ. ১৭৩)

* সপ্তম চক্কর শেষে মসজিদুল হারামে বা হারামের যে কোনো স্থানে দুই রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। (মানাসিক পৃ. ১৮০)

* সাঈ করার সময় যদি কোনো নামায শুরু হয়ে যায়, তাহলে সাঈ স্থগিত করে নামাযে শরীক হবে। নামায শেষে যেখানে স্থগিত করা হয়েছিল সেখান থেকে সাঈ শুরু করবে।

* সাঈ করার সময় কাঁধ ঢাকা থাকবে। ইহরামের কাপড় বগলের নিচে রাখা যাবে না।

* সাঈ করার সময় উযূ ভেঙ্গে গেলে পুনরায় উযূ করা জরুরী নয়। কারণ সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তবে উযূ করে নেয়া ভালো।

সাঈ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা: *তাওয়াফের সাত চক্করে যে সাত ধরনের যিকিরের কথা বলা হয়েছিল, সাঈর সাত চক্করেও সেগুলো আদায় করতে পারবে। এতে যিকির করাও হবে আবার চক্করের নম্বরও মনে থাকবে। কোনো ধরনের যিকির না করলেও সাঈ সহীহ হবে।*

চুল মুণ্ডানো বা ছোট করার আলোচনা

উমরার চতুর্থ কাজ চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা। এটি উমরার দ্বিতীয় ওয়াজিব।

* সাঈ করার পর উমরার একটি কাজ বাকী থাকে। তা হলো মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা। যাদের চুল আঙ্গুলের এক করের কম আছে তাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো জরুরী। আর যাদের চুল এক করের বেশি আছে তারা মুণ্ডাতে না চাইলে পুরো মাথা কিংবা কমপক্ষে মাথার একচতুর্থাংশের চুল অন্তত এক কর পরিমাণ ছাঁটবে। আর মহিলাদের সমস্ত চুলের অগ্রভাগ থেকে কমপক্ষে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫)

* চুল ছাঁটা বা মুণ্ডানোর সময় কেবলামুখী হয়ে বসা উত্তম এবং যিনি কাটবেন তিনি মাথার ডান পাশ থেকে শুরু করবেন।

* চুল কাটা শেষে তামাত্তু হজ্জকারী সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। এখন প্রয়োজন বোধ করলে গোসল করে সেলাই করা কাপড় পরতে পারবে এবং সব ধরনের হালাল কাজ করতে পারবে। তবে হারামের সীমানার মধ্যে যে-সব কাজ নিষেধ তা করতে পারবে না। যেমন: ঝগড়া করা, মারপিট করা, শিকার করা, গাছ কাটা ইত্যাদি। হারামের সীমানা হল কাবা ঘর থেকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে আনুমানিক নয় মাইল করে। আর উত্তর দিকে তিন মাইল। (মানাসিক পৃ. ১৮২)

* উমরা শেষে মক্কায় থাকা যায় আবার মদীনায়ও যাওয়া যায়। তবে তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য মদীনায় না যাওয়া উত্তম। কেননা মদীনায় গেলে এই উমরা দ্বারা তামাত্তু হজ্জ হবে কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ আছে।

উমরা শেষে যারা মক্কায় থাকবে তাদের করণীয়

১. পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করা জরুরী। সম্ভব হলে সব ওয়াক্তে মসজিদুল হারামে যাবে অন্যথায় মহল্লার মসজিদের জামাআতে শরীক হবে। আর বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করবে।

নফল তাওয়াফের নিয়ম: বাইতুল্লাহ শরীফের হাজারে আসওয়াদ সংবলিত কোণ বরাবর এসে, হাজারে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং নফল তাওয়াফের নিয়ত করবে। অর্থাৎ এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! আমি নফল তাওয়াফের ইচ্ছা করছি, আপনি তা সহজ করে দিন এবং কবূল করে নিন।' অনন্তর কান বরাবর হাত উঠিয়ে তাকবীর বলে হাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর হাতের ইশারায় হাজারে আসওয়াদ চুমু খাবে। এরপর সীনা সোজা করে উমরার তাওয়াফের মত সাত চক্কর দেবে। তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত নামায পড়বে। যমযমের পানি পান করবে। নফল তাওয়াফের মধ্যে রমল ও ইযতিবা নেই। নফল তাওয়াফ সাধারণ কাপড়েও করা যায়। নফল তাওয়াফের পর সাঈ নেই। এ সময় বেশি বেশি উমরা করার চেয়ে বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করা উত্তম। (মানাসিক পৃ. ১৮২)

১০. যার পক্ষে সম্ভব সে বেশি বেশি নফল উমরাও করতে পারবে। উমরা করার জন্য হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে নতুন করে উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। উত্তর দিকে হারামের সীমানা মাত্র তিন মাইল। তাই সাধারণত সকলে এ দিক থেকেই হারামের বাইরে যায়। উত্তর দিকে হারামের সীমানার পরে তানঈম নামক স্থানে 'মসজিদে আয়েশা' অবস্থিত। এই মসজিদের স্থান থেকে হযরত আয়েশা রাযি. উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। মক্কা শরীফ থেকে সেখানে সর্বদা বাস ও মাইক্রোবাস যাতায়াত করতে থাকে।

সেখানে উযূ-গোসলের সু-ব্যবস্থা আছে। সেখানে গিয়ে উমরার জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধতে পারবে। ইহরাম বাঁধার পর পূর্বে উল্লিখিত নিয়মে তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডিয়ে বা চুল ছোট করে উমরা শেষ করবে। মাথা মুণ্ডানোর সময় চুল না থাকলেও মাথায় ক্ষুর চালাতে হবে। (মানাসিক পৃ. ১৮২)

তাওয়াফ ও সাঈ সংক্রান্ত মহিলাদের বিশেষ মাসাইল

* উমরাহ ও হজ্জের সকল কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে এমন ওষুধ সেবন করতে পারবে। তবে এ কারণে যেহেতু শরীরের ক্ষতি হয়, তাই এরূপ না করা উত্তম।

* হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। এ অবস্থায় মসজিদে হারামেও প্রবেশ করা যাবে না। তাই ঐ দিনগুলোতে হোটেল বা বাসায় অবস্থান করবে এবং যিকির-আযকার, দু'আ ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে। বাজে ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে।

* হায়েয অবস্থায় কুরআন মাজীদ দেখে কিংবা মুখস্ত পড়া নিষেধ। তবে তালবিয়াসহ সব ধরনের যিকির-আযকার করা যাবে।

* হায়েয বন্ধকারী ওষুধ সেবন করার পর তা বন্ধ থাকলে হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলোতে নামায-রোযা ফরয থাকবে এবং তাওয়াফ, তিলাওয়াতসহ অন্য সব ইবাদত করা যাবে।

* ভিড়ের মধ্যে মহিলাগণ নফল তাওয়াফ করতে যাবে না। যখন ভিড় কম থাকে তখন পুরুষ থেকে যথাসম্ভব পৃথক হয়ে তাওয়াফ করবে। অন্যথায় নফল তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

* বর্তমানে হাজারে আসওয়াদে পুরুষদের ভিড় লেগেই থাকে। তাই মহিলাদের জন্য সরাসরি হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে যাওয়া ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, নেকী অর্জন করতে গিয়ে যেন গুনাহ না হয়ে যায়। কেননা নেকী অর্জন করা থেকে গুনাহ বর্জন করা বেশি জরুরী। (মানাসিক পৃ. ১১৫)

* মহিলাদের তাওয়াফে 'রমল' ও 'ইযতিবা' নেই। তাছাড়া মহিলারা এত দ্রুত হাঁটবে না যাতে শরীরের অবয়ব ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। (মানাসিক পৃ. ১১৫)

* ভিড় থাকলে তাওয়াফের দুই রাকআত ওয়াজিব নামায মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়ার প্রয়োজন নেই; বরং যেখানে সহজ হয় সেখানেই আদায় করবে। এক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য নির্ধরিত স্থানে নামায পড়াই ভালো। (মানাসিক পৃ. ১১৫)

* মুলতাযামে পুরুষদের ভিড় থাকলে সেখানেও যাবে না। বর্তমানে সেখানে সর্বক্ষণ ভিড় লেগেই থাকে, সুতরাং মুলতাযামে না যাওয়া উচিত।

* তাওয়াফ করা অবস্থায় হায়েয শুরু হয়ে গেলে তাওয়াফ বন্ধ করে মসজিদের বাইরে (বাসায় বা হোটেলে) চলে যাওয়া জরুরী। সে ক্ষেত্রে তিন চক্কর বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকলে পবিত্র হওয়ার পর নতুন করে তাওয়াফ শুরু করবে। চার বা চারের অধিক চক্কর হয়ে থাকলে তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। তাই পবিত্র হওয়ার পরে বাকীগুলো পুরা করা উত্তম, জরুরী নয়। (কিতাবুল মাসাইল ৩/৪০৩)

* সাঈর সময় সবুজ বাতিযুক্ত স্থান যেখানে পুরুষরা দ্রুত হাঁটে মহিলারা স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। (মানাসিক পৃ. ১১৫)

* মহিলারা হায়েয-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করতে না পারলেও সাঈ করতে পারবে। কারণ সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। (মানাসিক পৃ. ১৭৭)

হজ্জের আলোচনা

সম্প্রতি মুআল্লিমগণ ৭ই যিলহজ্জ রাত থেকে হাজীদেরকে মিনায় নেয়া শুরু করেন, তাই আমরা ৭ই যিলহজ্জ থেকে হজ্জের কার্যাবলির আলোচনা শুরু করবো। তবে মূল আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে হজ্জের ফরয এবং ওয়াজিবগুলো আলোচনা করা হচ্ছে।

হজ্জের ফরয তিনটি: ১. ইহরাম বাঁধা ২. উকূফে আরাফা অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ জোহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সামান্য সময়ের জন্য হলেও আরাফায় অবস্থান করা ৩. তাওয়াফে যিয়ারাত করা, অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হজ্জের তাওয়াফ করা।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ: ১. ৯ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় অবস্থান করা ২. সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ৩. নির্দিষ্ট দিনগুলোতে জামারাতে (শয়তান-স্তম্ভে) কঙ্কর মারা ৪. কিরান ও তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করা ৫. হালাল হওয়ার জন্য মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছাঁটা ৬. মীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা। [বাংলাদেশী হাজীদের জন্য এই তাওয়াফ করা ওয়াজিব।] (রদ্দুল মুহতার ২/১৭৮)

বি. দ্র. ৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করাও ওয়াজিব।

মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি: মিনায় অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ দুই-তিন কেজি ওজনের ছোট্ট একটি ব্যাগ নিবে। বড় ব্যাগ বাসায় রেখে যাবে। অন্যথায় মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে বড় ব্যাগ বা লাগেজ নিয়ে মুসিবতে পড়তে হবে। ছোট ব্যাগে এক সেট ইহরামের কাপড়, প্লেট-গ্লাস, ওষুধ ও টিস্যু পেপার নিবে। একটা হাওয়াই বালিশ ও একটা গায়ে দেয়ার চাদর নিতে পারে। শীতকাল হলে প্রয়োজনীয় গরম কাপড় নিতে ভুলবে না।

* ইহরাম বাঁধার আগে দাড়ি-মোচ ঠিক করে নিবে এবং শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করে নিবে।

* পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বেঁধে নিবে। এখন শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। নিয়তের মধ্যে বলবে– 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করছি, তুমি তা সহজ করে দাও এবং কবুল করে নাও।' এই নিয়ত করে তালবিয়া পড়লেই ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে। তালবিয়া তিনবার পড়া মুস্তাহাব।

* পুরুষদের জন্য মসজিদে হারামে গিয়ে ইহরাম বাঁধা ভালো। মহিলাদের জন্য নিজ বাসা বা হোটেল থেকে ইহরাম বেঁধে নেয়া ভালো।

* ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পড়তে শুরু করবে। বেশি-বেশি তালবিয়া পড়বে। ১০ই যিলহজ্জ জামারায়ে আকাবা তথা বড় শয়তানের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে পারবে। জামারায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করার সাথে সাথে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। ইহরাম বাঁধার পর ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকবে।

* ১০-১২ই যিলহজ্জের মধ্যে হজ্জের ফরয তাওয়াফের পরে সাঈ করা ওয়াজিব। কেউ চাইলে এই সাঈটা আগেও করে নিতে পারে। আগে এই সাঈ করতে চাইলে, হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর একটা নফল তাওয়াফ করে হজ্জের ওয়াজিব সাঈর নিয়তে সাঈ করবে। তাহলে পরবর্তীতে হজ্জের ফরয তাওয়াফ করার পরে আর সাঈ করতে হবে না। (মানাসিক পৃ. ১৮৭)

* বর্তমানে মুআল্লিমগণ সাধারণত ৭ই যিলহজ্জ রাতে হাজীদেরকে মিনায় নিয়ে যায়। তাই যারা আগে সাঈ করতে চায় তারা আসরের আগে ইহরাম বেঁধে নিবে। আসরের পর নফল তাওয়াফ করে সাঈ করবে। তবে আসরের পরে মাগরিবের পূর্বে তাওয়াফের নামায পড়বে না। বরং মাগরিবের ফরয নামায পড়ার পর প্রথমে তাওয়াফের ওয়াজিব নামায পড়ে নেবে, এরপর সুন্নাত পড়বে।

* মিনায় যাওয়ার সময় হলে যারা পথ-ঘাট চিনে না, তারা মুআল্লিম সাহেবের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করবে। মুআল্লিম সাহেবের গাড়িতে করে মিনার তাবুতে যাবে। আর যারা পথ-ঘাট চিনে অর্থাৎ যারা মিনায় গিয়ে নিজের তাবু খুঁজে বের

করতে পারবে বলে মনে করে, তারা ৭ই যিলহজ্জ রাতে মিনায় না গিয়ে ৮ই যিলহজ্জ মিনায় যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আট তারিখ সকালে ইহরাম বাঁধবে। এরপর অগ্রিম সাঈ করতে চাইলে নফল তাওয়াফ করে সাঈ করে নিবে। অনন্তর ছোট্ট ব্যাগটি হাতে নিয়ে সাফা-মারওয়ার পূর্বপাশের চত্বরে আসবে। এখানে এসে একটা টানেল (সুড়ঙ্গ) দেখতে পাবে, তার প্রবেশ পথে লেখা রয়েছে نفق طريق المشاة অর্থাৎ পায়দল পথচারীদের টানেল। এই টানেল দিয়ে পূর্বদিকে তিন মাইল হাঁটলে মিনায় পৌঁছে যাবে।

৮ই যিলহজ্জ করণীয়

মূলত ৮ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া সুন্নাত। যারা আগেও হজ্জ করেছে এবং রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা এই সুন্নাতের উপর আমল করে আট তারিখ সকালে মিনায় যেতে পারে। (মানাসিক পৃ. ১৮৮)

* ৮ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। অবস্থান ছাড়া এ দিন মিনায় হজ্জের অন্য কোনো জরুরী কাজ নেই।

মিনা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা: *বর্তমানে হাজীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একসাথে সকল হাজীর জন্য মিনায় স্থান সংকুলান হয় না। এ কারণে অনেক হাজীর তাঁবু মুযদালিফার সীমানায় পড়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মূলকথা হলো, কারো তাঁবু যদি মুযদালিফার সীমানায় পড়ে যায় তাতেও তার মিনায় অবস্থানের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। আবার উকূফে মুযদালিফাও ঐ তাঁবুতে করলেই চলবে। এছাড়া ১০ই যিলহজ্জ সকালে যখন মিনায় যেতে হয় সেক্ষেত্রেও ঐ তাঁবুতে থাকলেই চলবে। তবে কঙ্কর মারার সময় অবশ্য মিনায় যেতেই হবে।*

* মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায (আট তারিখের যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও নয় তারিখের ফজর) পড়া মুস্তাহাব। (মানাসিক পৃ.১৮৮)

মিনায় অবস্থানকালে করণীয়

ক. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে পড়া।

খ. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করা।

গ. হজ্জের মাসআলা-মাসাইলের তা'লীম করা।

ঘ. নয় তারিখ ফজরের নামাযের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক পড়তে শুরু করা। নামায শেষে প্রথমে তাকবীরে তাশরীক পড়া, এরপর তালবিয়া পড়া। তাকবীরে তাশরীকের আমল তের তারিখ আসর পর্যন্ত চলবে। (রদ্দুল মুহতার ২/১৮০)

৯ই যিলহজ্জ এর আমল

সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। (বর্তমানে মুআল্লিমরা আট তারিখ রাতেই অনেককে আরাফায় পৌঁছে দেয়। আবার কেউ ভিড়ের ভয়ে আট তারিখ রাতেই আরাফায় চলে যায়। অথচ যথাসম্ভব আট তারিখ রাতে আরাফায় না যাওয়া উচিত। কারণ, আট তারিখ রাতে আরাফায় থাকলে কোনো সাওয়াব হয় না। পক্ষান্তরে আট তারিখ মিনায় রাত্রি যাপন করা এবং নয় তারিখ ফজরের নামায মিনায় পড়া সুন্নাত। সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা করা মুস্তাহাব। সুতরাং আট তারিখ রাতে আরাফায় না গিয়ে মিনায় অবস্থান করা উচিত। তবে কারো সব সাথী যদি চলে যায়, আর নিজেরও আরাফায় হেঁটে যাওয়ার এবং তাঁবু খুঁজে পাওয়ার পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে সাথীদের সাথে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু মুস্তাহাব হলো, নয় তারিখ সূর্যোদয়ের পরে আরাফায় যাওয়া। (মানাসিক পৃ. ১৮৯)

* আরাফায় যাওয়ার পথে তালবিয়া, তাহলীল ও অন্যান্য যিকির এবং দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। (মানাসিক পৃ. ১৮৯)

* জাবালে রহমত দৃষ্টিগোচর হলে বেশি বেশি যিকির, দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে। (মানাসিক পৃ. ১৯০)

আরাফায় করণীয়: আরাফায় পৌঁছে যোহরের আগেই গোসল করে নিবে। উকূফের জন্য গোসল করা সুন্নাত। গোসল করা সম্ভব না হলে উযূ করে নিবে। (মানাসিক পৃ. ১৯১)

* খানা-পিনা ও অন্যান্য জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে নিবে। এ দিন মুআল্লিম সাধারণত নির্দিষ্ট সময় খাবার সরবরাহ করে থাকে। সুতরাং খাবারের জন্য কোনো ফিকির করার প্রয়োজন নেই।

* নিজ তাঁবুতে জামাআতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে যোহরের নামায আদায় করবে।

বি.দ্র. আরাফায় যোহরের ওয়াক্তে একসঙ্গে যোহর-আসর কেবল ঐ হাজীগণ পড়বে, যারা মসজিদে নামিরায় 'আমীরুল হজ্জ'-এর ইমামতিতে নামায পড়ে। কিন্তু যারা তাঁবুতে নামায পড়ে, তারা স্বাভাবিক নিয়মে যোহরের ওয়াক্তে যোহর আর হানাফী মাযহাব মতে আসরের ওয়াক্তে আসর পড়বে। তবে কেউ যদি তাঁবুতে যোহর-আসর একত্রে পড়ে ফেলে, তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে জড়াবে না। (মানাসিক পৃ. ১৯৬)

* হাজীদের জন্য আরাফার দিনের নফল রোযা না রাখা ভালো। কেননা পরের দিন হজ্জের অনেক কাজ করতে হবে। তাই নয় তারিখ রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা আছে। ফলে কাজগুলো পালনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

আরাফায় অবস্থানের সময়: উকূফে আরাফা অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ফরয। উকূফে আরাফা করতে না পারলে হজ্জ হবে না। ৯ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফে আরাফার মূল সময়। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকেই আরাফায় অবস্থান করা সুন্নাত। সূর্যাস্তের আগে আরাফায় পৌঁছে গেলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের আগে আরাফা ত্যাগ করা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি উক্ত সময়ে আরাফায় উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে আগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোনো সময় সামান্য কিছুক্ষণ আরাফায় অবস্থান করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। এমনকি যদি কোনো অসুস্থ, অচেতন হাজীকে সাথীরা কোনোভাবে উক্ত সময়ের মধ্যে এক মিনিটের জন্যও আরাফার ময়দানে উপস্থিত করতে পারে, তাহলেও তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। (মানাসিক পৃ. ২০৪-২০৫)

চারটি রাত পূর্ববর্তী দিনের অংশ হিসেবে গণ্য হয়: মুসলমানদের জন্য চান্দ্র মাসে রাত আগে আসে আর দিন পরে আসে। কিন্তু হজ্জের চার দিন হাজীদের জন্য তাদের সুবিধার্থে শরীয়ত রাতকে দিনের পরে ধরেছে। তাই ৯, ১০ ,১১ ও ১২ই যিলহজ্জ দিন শেষে যে রাত আসে তা ঐদিনের অংশ হিসেবে গণ্য হয়। এ জন্যই নয় তারিখ দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে উকূফে আরাফা করতে পরলেও উকূফে আরাফার ফরয আদায় হয়ে যায় এবং ১০, ১১, ১২ তারিখ রাতে পাথর মারা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও পাথর মারার ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। তবে ফরয তাওয়াফ ১২ তারিখ মাগরিবের আগে করা জরুরী। কেননা ফরয তাওয়াফের ব্যাপারে ১২ তারিখের রাত দিনের মধ্যে শামিল নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/৫২১)

আরাফায় উকুফের সময় করণীয়: যোহরের নামায শেষে সম্ভব হলে জাবালে রহমতের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান নিবে। দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে উকূফ করা সুন্নাত। সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না হলে দাঁড়িয়ে উকূফ শুরু করবে। যতক্ষণ সম্ভব হয় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর বসে, শুয়ে যেভাবে সম্ভব উকূফ করবে। উকূফের পূর্ণ সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করতে থাকবে। কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলবে না। একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকবে । পুরোটা সময় দু'আ,

যিকির, ইস্তিগফার, তালবিয়া ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিতির অনুভূতি নিয়ে বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। মুনাজাতের সময় হাত তুলে মুনাজাত করবে। হাদীস শরীফে এ সময়ে দু'আ কবূলের ওয়াদার কথা বর্ণিত হয়েছে। জাবালে রহমত বাংলাদেশীদের তাঁবু থেকে বেশ দূরে। অপর দিকে লাখো তাঁবুর মধ্যে রাস্তা ঠিক রাখাও কঠিন ব্যাপার। তাই জাবালে রহমতে না গিয়ে তাঁবুর ভেতরে উকূফ করলেও হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করা। [কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়তে চাইলে 'মুনাজাতে মাকবূল' কিতাব থেকে সহজে পড়তে পারবে।] (মানাসিক পৃ. ১৯৯)

যেখানে উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়: আরাফার ময়দানে মসজিদে নামিরাসংলগ্ন পশ্চিম দিকের কিছু নীচু স্থানকে 'বতনে উরনা' বলে। এখানে অবস্থান করলে উকূফে আরাফার ফরয আদায় হবে না। (মানাসিক পৃ. ১৯০)

সূর্যাস্তের পর করণীয় : সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়ে আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা করতে হবে (মুযদালিফা আরাফার মতই একটা ময়দান। নয় তারিখ দিবাগত রাতে ফজরের নামাযের পর মুযদালিফায় উকূফ করা ওয়াজিব)। অনেকে সূর্যাস্তের আগেই আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা করে। এটা বড় ধরনের অজ্ঞতা। যারা সূর্যাস্তের আগে আরাফার সীমানার বাইরে যাবে, তারা যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে। তবে কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে বাসে উঠে বসে থাকে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে বাস যেন আরাফার সীমানার বাইরে না যায়। (মানাসিক পৃ. ২১০)

উল্লেখ্য, আরাফা থেকে মুযদালিফায় যাওয়ার জন্য কয়েকটি প্রশস্ত পায়দল চলার রাস্তা আছে। বাসে করে যাওয়ার চেয়ে এ রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া বেশি নিরাপদ।

* মুযদালিফায় যাওয়ার পথে বেশি বেশি তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দুরূদ ও ইস্তিগফার পড়তে থাকবে।

* মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর এক আযান ও এক ইকামাত দিয়ে প্রথমে মাগরিব এরপর কোনো রকম বিরতি না দিয়ে অর্থাৎ মাগরিবের পর সুন্নাত, নফল বা অন্য কোনো কাজে মশগুল না হয়ে ইশা পড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে ইশার নামাযে ইকামাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে মাগরিব পড়ে যদি অন্য কোনো কাজ করা হয়, তাহলে ইশার জন্য ভিন্ন ইকামাত দিতে হবে। মুযদালিফায় একত্রে মাগরিব-ইশা পড়ার এই হুকুম জামাআতে ও একাকী নামায আদায়কারী উভয়ের জন্য। মহিলাদের জন্য এই হুকুমে কোনো ভিন্নতা নেই। অর্থাৎ তারাও মাগরিব-ইশা ইশার ওয়াক্তে পড়বে। ইশা আদায়ের পর প্রথমে মাগরিবের সুন্নাত পড়বে। তারপর ইশার সুন্নাত ও বিতির পড়বে। (মানাসিক পৃ. ২১৪)

* ইশার ওয়াক্তের মধ্যে মুযদালিফায় পৌঁছা সম্ভব না হলে অর্থাৎ পথিমধ্যে সুবহে সাদিক হওয়ার আশংকা হলে, পথে মাগরিব ও ইশা পড়ে নিবে। এরপর ঘটনাক্রমে ইশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগেই যদি মুযদালিফায় পৌঁছে যায় তাহলে মাগরিব ইশা পুনরায় পড়তে হবে। তাই এক্ষেত্রে উত্তম হলো ইশার ওয়াক্ত ২০/২৫ মিনিট বাকী থাকতে নামায পড়তে দাঁড়ানো। যাতে নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওয়াক্তও শেষ হয়ে যায় এবং একই নামায দুইবার পড়তে না হয়। (মানাসিক পৃ. ২১৬-২১৭)

* কেউ ইশার ওয়াক্ত হওয়ার আগে মুযদালিফায় পৌঁছে গেলে তখন মাগরিব পড়বে না ; বরং অপেক্ষা করে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব-ইশা একত্রে পড়বে। (মানাসিক পৃ. ১১৮)

মুযদালিফায় যাত্রার অভিজ্ঞতা : *মুযদালিফা আরাফা থেকে ৩/4 মাইল দূরে। আরাফা থেকে গাড়িতে ও পায়ে হেঁটে উভয়ভাবে মুযদালিফায় যাওয়া যায়। তবে গাড়িযোগে গেলে পথ কম হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে পথে ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। তাই যাদের হাঁটার ক্ষমতা আছে, তাদের জন্য হেঁটে যাওয়াই ভালো।*

* ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় থাকা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। (মানাসিক পৃ. ২১৮)

৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় করণীয় : সাধারণত আরাফা থেকে মুযদালিফায় আসতে আসতে হাজীগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই ইশার নামায পড়ে খানা খেয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বে, যাতে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যায় এবং সুবহে সাদিকের সাথে সাথে ফজর পড়ে উকূফে মুযদালিফায় মশগুল থাকা যায়। (মানাসিক পৃ. ২১৮)

* এখান থেকে ছোলা বুটের মতো কিংবা সর্বোচ্চ খেজুরের বিচির আকৃতির সাতটি পাথর সংগ্রহ করে রাখবে। ১০ তারিখ বড় শয়তানকে মারার জন্য সাতটি পাথর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করে রাখা মুস্তাহাব। (মানাসিক পৃ. ২২২)

পাথরের ধরন : ১০ তারিখ বড় শয়তানকে মারার জন্য যে পাথর সংগ্রহ করা হবে এবং পরবর্তী দিনগুলোতে যেসব পাথর মারা হবে, সেগুলোর আকার ছোলা বুট কিংবা সর্বোচ্চ খেজুরের বিচির মতো হবে। বড় পাথর মারা মাকরূহ। পাথর পবিত্র হতে হবে, অপবিত্র পাথর মারা মাকরূহ। অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকলে ধুয়ে নিলেই চলবে। পাথর পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র হোক সর্বাবস্থায় ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব। বড় পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নেয়াও মাকরূহ। তাই ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করে নিবে। দশ তারিখের পাথর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করাই মুস্তাহাব, তবে পরবর্তী দিনগুলোর পাথর যে কোনো স্থান থেকেই সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথর যা শয়তান-স্তম্ভের আশেপাশে পড়ে থাকে সেগুলো সংগ্রহ করা যাবে না। (মানাসিক পৃ. ২২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭)

মুযদালিফায় উকূফের সময় : ৯ তারিখ দিবাগত রাতের শেষে অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত উকূফে মুযদালিফার সময়। উক্ত সময়ের মধ্যে এক মিনিটের জন্যও যদি কেউ মুযদালিফার সীমানায় আসে তাহলে উকূফে মুযদালিফার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে চারদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাত। কেউ যদি সুবহে সাদিকের আগে মুযদালিফা ত্যাগ করে কিংবা সূর্যোদয়ের পরে মুযদালিফায় আসে তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না। তাকে দম দিতে হবে। তবে কেউ অসুস্থতার কারণে মুযদালিফায় আসতে না পারলে কিংবা মহিলারা ভিড়ের কারণে মুযদালিফায় উকূফ করতে না পারলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে না। (মানাসিক পৃ. ২১৯)

উকূফের সময় করণীয় : আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে নিবে। এরপর চারদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত উকূফ করবে। দাঁড়িয়ে কিংবা খোলা আকাশের নিচে উকূফ করার প্রয়োজন নেই। তাবু মুযদালিফার ভেতরে থাকলে, তাঁবুতে বসেই উকূফ করবে। আরাফায় উকূফের সময় যেসব আমল করেছে, এখানেও সেগুলো করবে। অর্থাৎ তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দুরূদ, দু'আ ও ইস্তিগফারে মশগুল থাকবে। কোনো প্রকার বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না।

১০ তারিখের কার্যাবলির বর্ণনা

যিলহজ্জের ১০ তারিখ হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ রয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো।

মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা : চারদিক যখন ভালো মতো ফর্সা হবে তখন (সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে) মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। সূর্যোদয়ের সময় বা তার পরে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করা সুন্নাতের খেলাফ। (মানাসিক পৃ. ২২১)

* পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে।

১০ তারিখের প্রথম কাজ : বড় শয়তানের কাছে গিয়ে শুধু বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবে। ১০ তারিখে শুধু বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা হজ্জের অন্যতম ওয়াজিব আমল।

তালবিয়া বন্ধ : পাথর নিক্ষেপ করতে যাওয়ার সময় পথে বেশি বেশি তালবিয়া পড়বে। কারণ কিছুক্ষণ পরই তালবিয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

বড় শয়তানের কাছে পৌঁছে প্রথম পাথর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। এখন থেকে হজ্জের শেষ পর্যন্ত আর তালবিয়া পড়া জায়েয নেই। (মানাসিক পৃ. ২২৫)

১০ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের সময়সূচী : বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের সময় ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ ৯ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক থেকে ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তবে ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মুস্তাহাব সময়। সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৈধ সময়। (কিন্তু সুবহে সাদিকের পর যেহেতু উকূফে মুযদালিফা করতে হয় তাই এ সময় পাথর নিক্ষেপের সুযোগ নেই। তবে তখন ভিড় কম থাকায় মহিলারা কিছুক্ষণ উকূফ করে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে।) সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে ভিড়ের কারণে মহিলা কিংবা মাযূর ব্যক্তিরা রাতে পাথর মারলে মাকরূহ হবে না। (মানাসিক পৃ. ২২৩-২২৪)

পাথর নিক্ষেপ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা-১ : *উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যখন ভিড় কম থাকে, খোঁজ-খবর নিয়ে তখন পাথর নিক্ষেপ করতে যাবে। পুরুষরা দিনে পাথর নিক্ষেপ শেষ করতে চেষ্টা করবে। সাধারণত রাতের বেলা ভিড় কম হয়, তাই মহিলাদেরকে রাতের বেলা পাথর নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে। বর্তমানে ভিড়ের যে অবস্থা, তাতে দুর্বল, মাযূর বয়স্ক পুরুষরাও যদি আসরের পরে বা রাতে পাথর মারতে যায়, তাহলে পরিস্থিতির কারণে মাকরূহ হবে না ইনশাআল্লাহ ।*

পাথর নিক্ষেপের পদ্ধতি: সম্ভব হলে মিনাকে ডানে আর কাবা শরীফকে বামে রেখে স্তম্ভগুলোর দক্ষিণ পাশে চেহারা উত্তরমুখী করে দাঁড়াবে। অন্যথায় যেভাবে সম্ভব দাঁড়াবে। অতঃপর ডান হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা পাথর ধরে প্রতিবার একটি করে সাত বারে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। বিরতি না দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। পাথর দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে ফেলতে হবে। কোনো পাথর যদি বেষ্টনীর মধ্যে না পড়ে তাহলে সেটা ধর্তব্য হবে না। সেটার স্থানে আরেকটি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। তাই অতিরিক্ত দুই-তিনটি পাথর সাথে রাখা ভালো। বেষ্টনীর ভিতর যে দেয়াল আছে, যাকে শয়তান বলা হয়, তার গায়ে পাথর মারার প্রয়োজন নেই। তবে উক্ত দেয়ালের গোড়ায় পাথর ফেলতে পারলে ভালো। একসাথে সাতটি পাথর মারলে একটি ধরা হবে। বাকী ছয়টি পুনরায় মারতে হবে। (মানাসিক পৃ. ২৪৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৮)

* প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় এ দু'আ পড়বে: بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

সম্ভব হলে নিম্নের দু'আটিও পড়বে :

رَغْمًالِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا.

* *অনেকে শয়তান-স্তম্ভের গায়ে জুতা, ছাতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে, এটা জায়েয নেই। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭)*

* সপ্তম পাথর নিক্ষেপের পর দ্রুত ওখান থেকে চলে আসবে। ওখানে দাঁড়িয়ে কোনো দু'আ-দুরূদ পড়বে না। ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে দু'আ-দুরূদ পড়তে পারবে। তবে তালবিয়া পড়বে না। (মানাসিক পৃ. ২২৪)

পাথর নিক্ষেপ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা-২: *শয়তান-স্তম্ভের চারদিকে যে দেয়াল আছে, কোনো একদিক দিয়ে ভিড় এড়িয়ে এ দেয়ালের পশ্চিম দিকে চলে গেলে ভিড় অনেক কম হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে পাথর নিক্ষেপ করা যায়। এ সুযোগ নেয়া যেতে পারে।*

অন্যকে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করানো: নিজের পাথর নিজে মারা ওয়াজিব। নিজে সুস্থ ও সক্ষম থাকা অবস্থায় অন্যকে দিয়ে পাথর মারানো জায়েয নেই। তবে কেউ যদি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে না কিংবা পাথর মারতে গেলে রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা হয়, তাহলে সে অন্যের মাধ্যমে পাথর মারাতে পারবে। এই হুকুম পুরুষ-মহিলা সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনো হাজী যদি ভিড়ের অজুহাতে অন্যকে দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করায়, তাহলে তার পাথর নিক্ষেপের ওয়াজিব আদায় হবে না। (মানাসিক পৃ. ২৪৮)

* মাযূর ব্যক্তির পক্ষ থেকে পাথর মারতে হলে তার অনুমতি লাগবে। অনুমতি ছাড়া পাথর মারলে ওয়াজিব আদায় হবে না। তবে ছোট বাচ্চা, অচেতন ও পাগলের অনুমতি ছাড়াই তাদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে পাথর মারতে পারবে। (মানাসিক পৃ. ২৪৭-২৪৮)

সময় মতো পাথর নিক্ষেপ করতে না পারলে: ১০ তারিখ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিকের আগে বড় শয়তানকে পাথর মারতে না পারলে দম ওয়াজিব হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি কোনো সমস্যার কারণে পরবর্তী দিনগুলোতে পাথর মারতে না পারে তাহলেও তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এই তিনদিনের জন্য একটি দমই যথেষ্ট হবে। (মানাসিক পৃ. ২৪১, রদ্দুল মুহতার ৩/৬১৯ রশীদিয়া কুতুবখানা)

১০ তারিখের দ্বিতীয় কাজ: কুরবানী করা। এটাও ওয়াজিব আমল।

* বড় শয়তানকে পাথর মারার পর তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য হজ্জের শুকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব। (মানাসিক পৃ. ২২৬)

* ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে করতে পারলে ভালো। মানাসিক পৃ.২২৬

উল্লেখ্য, *বর্তমানে অনেকে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করায়। অথচ ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করানো সতর্কতার পরিপন্থী। কেননা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে সময়ে কুরবানী করার কথা বলে, চাপের কারণে সাধারণত সে সময়ের মধ্যে কুরবানী করতে পারে না। সুতরাং যদি তাদের দেয়া সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে মাথা মুণ্ডানো হয় বা চুল ছাঁটা হয়, আর কুরবানীর পশু তখন পর্যন্ত জবাই করা না হয়, তাহলে কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডানোর অপরাধে দম ওয়াজিব হবে। কারণ, তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য কুরবানী করার আগে মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা নিষেধ, অথচ সে জানতেই পারবে না যে, তার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে। এভাবে তার হজ্জ ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে। তাই যথাসম্ভব ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করাবে না। তবে কেউ যদি কোনো উপায়ে নিশ্চিত হতে পারে যে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কুরবানী করে দিয়েছে, তাহলে তখন হলক করতে কোনো সমস্যা নেই এবং সেক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে বাস্তবতা হল, এটা জানা সম্ভব হয় না।*

তাই এই ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। (মানাসিক পৃ. ২২৬)

কুরবানীর সময়ঃ ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় কুরবানী করলে কুরবানীর ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে ১০ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারার আগে কুরবানী করলে দম ওয়াজিব হবে। তাই বলা হয়, হাজীদের জন্য কুরবানীর সময় শুরু হয় দশ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারার পর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (মানাসিক পৃ. ২৬৩)

একাধিক কুরবানী করাঃ যার সামর্থ্য আছে তার জন্য একাধিক কুরবানী করা ভালো। হাদীস শরীফে হজ্জের মধ্যে বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে ও কুরবানী করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হজ্জের সময় একাধিক কুরবানী করেছিলেন। একাধিক কুরবানী করলে অতিরিক্তটির ক্ষেত্রে এভাবে নিয়ত করতে পারে, 'যদি দম ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে দম অন্যথায় নফল কুরবানী।' (তিরমিযী শরীফ হা. নং ৮২৭, মানাসিক পৃ. ২৩৪)

কুরবানীর স্থানঃ হজ্জের কুরবানীর পশু এবং দম অর্থাৎ জরিমানার পশু হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করা জরুরী। হারামের বাইরে জবাই করলে কুরবানী এবং দম কোনোটাই আদায় হবে না। হারামের যে কোনো স্থানেই কুরবানী করা যায়। (রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২)

হাজীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানীর হুকুমঃ ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিক থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় যদি কেউ মুসাফির থাকে, তাহলে তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। অতএব, কোনো হাজী সাহেব যদি উক্ত সময়ে মুসাফির থাকে, তাহলে তার জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। আর যদি মুকীম হয়ে থাকে এবং নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে হজ্জের কুরবানীর সাথে ঈদুল আযহার জন্য ভিন্ন কুরবানী করতে হবে। ঈদুল আযহার কুরবানী মক্কা-মিনায়ও করতে পারে, কিংবা দেশের বাড়িতেও করতে পারে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৬৪৪ রশীদিয়া)

মুকীম ও মুসাফিরঃ মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানের দিনসমূহ মিলিয়ে সামষ্টিকভাবে যাদের ১৫ দিন থাকা হচ্ছে এবং ১৫ দিন থাকার নিয়তও করেছে তারা মুকীম। যারা প্রথমে মদীনায় গিয়েছিল, হজ্জের আগে মক্কায় এসেছে, তারা মক্কায় আসার পর থেকে মক্কা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানের দিনগুলোসহ ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকার নিয়ত করলে তারাও মুকীম হয়ে যাবে। যারা মুকীম সাব্যস্ত হবে তারা পূর্ণ নামায পড়বে এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে থাকলে তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করাও ওয়াজিব হবে। যারা মক্কা-মিনা মিলিয়ে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করবে না বরং ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করবে তারা মুসাফির সাব্যস্ত হবে। তারা নিজেরা নামায পড়লে কসর পড়বে এবং তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করাও ওয়াজিব নয়। (রদ্দুল মুহতার ২/৫১৫)

হজ্জের কুরবানীর গোশতের হুকুমঃ হজ্জের কুরবানীর গোশতের হুকুম ঈদুল আযহার কুরবানীর গোশতের মতোই। নিজেও খেতে পারবে, অন্যকেও খাওয়াতে পারবে, দান-সদকাও করতে পারবে, মজুদ করেও রাখতে পারবে। তবে জরিমানা স্বরূপ যে দম দেয়া হয় তার গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। বরং তা ফকীর মিসকীনদেরকে দিয়ে দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৬৩৬ রশীদিয়া)

যার কুরবানীর সামর্থ্য নেইঃ তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর উপর হজ্জের কুরবানী করা ওয়াজিব । কারো যদি এই কুরবানী করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে তাকে কুরবানীর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। ১০ তারিখের আগে তিনটি রোযা রাখতে হবে। বাকী সাতটি হজ্জ থেকে পরিপূর্ণরূপে ফারেগ হয়ে সুযোগমত যে-কোনো সময় রাখতে পারবে। ১০ তারিখের আগে যদি ৩টি রোযা না রাখা হয়, তাহলে কুরবানী করাই নির্ধারিত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ১০ তারিখ কুরবানীর কোনো ব্যবস্থা না হলে কুরবানী না করেই সে হলক বা কসর করে হালাল হয়ে যাবে। এরপর পরবর্তীতে যখন সক্ষম হবে তখন হারামের সীমানার মধ্যে দু'টি পশু জবাই করাতে হবে। একটি হজ্জের কুরবানীর জন্য আরেকটি কুরবানী না করে হালাল হওয়ার দম হিসেবে। (মানাসিক পৃ. ২৬৩-৬৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৪ দারুল কুতুব)

উল্লেখ্য, ১০ই যিলহজ্জ হজ্জের অনেক কাজ থাকায় হাজীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঈদের নামায মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের ঈদের নামায পড়তে হবে না। তবে নামাযের সময় কেউ যদি মক্কায় উপস্থিত থাকে এবং বাইতুল্লাহ শরীফের জামাআতে শরীক হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯)

১০ই যিলহজ্জ তৃতীয় কাজঃ চুল কাটা। এটা হজ্জের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল।

* ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করার পর চুল কাটতে হবে। কুরবানী করার পর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত চুল কাটার সময়। এই সময়ের মধ্যে চুল কাটতে না পারলে দম ওয়াজিব হবে। হারামের সীমানার মধ্যে চুল কাটতে হবে। মিনায় চুল কাটা সুন্নাত। হারামের সীমানার বাইরে চুল কাটলে যদিও হালাল হওয়া যাবে কিন্তু দম ওয়াজিব হবে। (মানাসিক পৃ. ২৩০)

* কারো মাথায় চুল না থাকলেও (আগে মুণ্ডানোর কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে) মাথায় ক্ষুর ঘুরাতে হবে। এতেই সে হালাল হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৬১২ রশীদিয়া)

বি. দ্র. উমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় যে-সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা হয়েছে, এখানেও সেগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

* চুল কাটার পর স্ত্রী ব্যতীত ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ সব কিছু হালাল হয়ে যাবে। তাওয়াফে যিয়ারাত অর্থাৎ হজ্জের ফরয তাওয়াফ করার পর স্ত্রীও হালাল হয়ে যাবে। (মানাসিক পৃ. ২৩১)

* চুল কেটে গোসল করে সাধারণ কাপড় পরে ফরয তাওয়াফ করার জন্য যেতে পারে। আবার গোসল না করে এবং ইহরামের কাপড় না পাল্টেও যেতে পারে।

১০ই যিলহজ্জের চতুর্থ কাজঃ তাওয়াফে যিয়ারাত। তাওয়াফে যিয়ারাত হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয।

ফরয তাওয়াফের সময়ঃ ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে এই তাওয়াফের সময় শুরু হয়। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাওয়াফ সম্পন্ন করা ওয়াজিব।

কেউ যদি উক্ত সময়ের মধ্যে এই তাওয়াফ করতে না পারে তাহলে জীবনের যে কোনো সময়ে তাওয়াফ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফ করতে না পারার কারণে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু মহিলারা যদি ঋতুস্রাবের কারণে উক্ত সময়ে তাওয়াফ করতে না পারে, বরং এর পরে করে, তাহলে তাদের উপর দম ওয়াজিব হবে না। (মানাসিক পৃ. ২৩২-৩৩, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের ১/৩৫৭)

উল্লেখ্য, তামাত্তু ও কিরানকারীর জন্য ১০ তারিখ বড় শয়তানকে পাথর মারা, কুরবানী করা এবং চুল কাটা এই তিনটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব। কিন্তু ফরয তাওয়াফ এবং এই তিন কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী নয়। অতএব কেউ চাইলে হালাল হওয়ার আগেও ফরয তাওয়াফ করতে পারবে। তবে ঐ তিনটি কাজ করার পর এই তাওয়াফ করা সুন্নাত। (মানাসিক পৃ.

২৩৩)

তাওয়াফে যিয়ারাতের পদ্ধতি: উমরার তাওয়াফ যেভাবে করেছে তাওয়াফে যিয়ারাতও সেভাবে করবে। তবে কুরবানী করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হওয়ার পর এই তাওয়াফ করলে এই তাওয়াফের মধ্যে ইযতিবা করতে হবে না, শুধু রমল করতে হবে। আর যদি সাঈ আগে করে থাকে তাহলে ইযতিবা, রমল কোনটিই করতে হবে না।

* তাওয়াফে যিয়ারাত বা হজ্জের ফরয তাওয়াফ যত অসুস্থই হোক নিজেই করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এই তাওয়াফ অন্যের মাধ্যমে করানো যাবে না। অতএব কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে হুইল চেয়ারে করে তাওয়াফ করবে। প্রয়োজন হলে হুইল চেয়ার ঠেলার জন্য কাউকে ভাড়া নিবে। এ ক্ষেত্রে তাওয়াফকারীর হুশ থাকলে সাহায্যকারীর তাওয়াফের নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় সাহায্যকারী নিজেও তাওয়াফের নিয়ত করবে এবং অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তাওয়াফ করার নিয়ত করবে। মূল তাওয়াফকারী অচেতন থাকা অবস্থায় সাহায্যকারী যদি নিজের এবং সাহায্যকৃত ব্যক্তির তাওয়াফের নিয়ত না করে তাহলে ঐ অচেতন ব্যক্তির তাওয়াফ আদায় হবে না। (মানাসিক পৃ. ১৪৮-৪৯)

* সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য তাওয়াফে যিয়ারাত পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব। (মানাসিক পৃ. ২৩৩)

*মাতাফ, মসজিদে হারামের দ্বিতীয় তলা এবং ছাদে তাওয়াফ করা যায়। সেখানে সহজ মনে হবে সেখানে তাওয়াফ করবে।

হজ্জের সাঈ করা: *সাঈও হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমল।*

* যারা ৮ই যিলহজ্জ মিনায় যাওয়ার আগে হজ্জের সাঈ করেছে তাদের এখন (ফরয তাওয়াফের পরে) সাঈ করার প্রয়োজন নেই। যারা সাঈ করেনি তারা সাঈ করবে। (মানাসিক পৃ. ২৩২)

* উমরার আলোচনায় সাঈর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেখান থেকে সাঈর পদ্ধতি আবার দেখে নিবে এবং সে অনুযায়ী সাঈ করবে।

* ফরয তাওয়াফ করে সাঈ করা উত্তম। ফরয তাওয়াফের পরে যে কোনো সময় সাঈ করা যায়। সাঈর কোনো শেষ সময়-সীমা নেই। (রদ্দুল মুহতার ৩/ ৬৬৬ রশীদিয়া)

১০ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

ফরয তাওয়াফ এবং সাঈ (আগে না করে থাকলে) সম্পন্ন করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মিনায় চলে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করার পর দ্রুত মিনায় চলে এসেছিলেন। ১০ তারিখ ও ১১ তারিখ রাত এবং ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় থাকা সুন্নাত। এ সময় শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরূহ। তবে কেউ চাইলে তাওয়াফ-সাঈ করার জন্য মক্কায় যেতে পারবে। ১০ তারিখ তাওয়াফ করে ফিরতে ফিরতে যদি রাত হয়ে যায় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ রাতের অধিকাংশ সময় মিনায় থাকলেই মিনায় রাত্রি যাপনের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (মানাসিক পৃ. ২৩৪-৩৬)

১১ই যিলহজ্জ করণীয়: যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোনো সময়ে ছোট, মেজো ও বড় শয়তানকে সাতটি করে পাথর মারা ওয়াজিব। ১১ ও ১২ তারিখ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে পাথর মারার সময় শুরু হয়। এর পূর্বে পাথর মারলে ওয়াজিব আদায় হবে না। এ দিন পাথর মারার সময় যদিও সুবহে সাদিক পর্যন্ত, কিন্তু সূর্যাস্তের আগে পাথর মারা সুন্নাত। আর সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সক্ষম লোকদের জন্য মাকরূহ সময়। মহিলা, বাচ্চা, দুর্বল ও বয়স্ক লোকদের জন্য রাতে পাথর মারা মাকরূহ নয়। সুতরাং মহিলা ও মাযূর ব্যক্তিরা তাড়াহুড়া করে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করবে না, বরং ভিড় কমলে পাথর মারতে যাবে। পাথর মারার স্থান পাঁচ তলা করা সত্ত্বেও হুড়াহুড়ির কারণে এখনও অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। (মানাসিক পৃ. ২৩৭-৪০)

উল্লেখ্য, এ দিন তিনও শয়তানকে পাথর মারতে হবে। প্রথমে ছোট শয়তানকে ৭ টি পাথর মেরে একটু সামনে গিয়ে হাত তুলে খুব মনোযোগ দিয়ে, কান্নাকাটি করে, দীর্ঘ সময় ধরে নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। এরপর মেজো শয়তানকে ৭ টি পাথর মেরে একটু সামনে গিয়ে হাত তুলে দু'আ করবে। সবশেষে বড় শয়তানকে ৭ টি পাথর মারবে। কিন্তু এখানে দু'আর জন্য দাঁড়াবে না । আসার পথে হাঁটতে-হাঁটতে দু'আ করতে পারে। বড় শয়তানকে পাথর মেরে দ্রুত মিনার তাঁবুতে ফিরে এসে অবস্থান করবে। (মানাসিক পৃ. ২৪১-৪২)

* পাথর মারার বিস্তারিত বিবরণ ১০ই যিলহজ্জের করণীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

*আগের দিন ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজকে ফরয তাওয়াফ করবে। সাঈ না করে থাকলে সাঈও করবে।

১২ই যিলহজ্জ করণীয়: এ দিনও তিনও শয়তানকে পাথর মারা ওয়াজিব। ১২ তারিখের পাথর মারার সময়-সীমা ১১ তারিখের মতোই। এ দিন রাতে কেউ মিনায় থাকতে না চাইলে সূর্যাস্তের আগেই পাথর মেরে মিনা ত্যাগ করতে হবে। সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ। কারো যদি মিনা ত্যাগের আগেই সুবহে সাদিক হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ১৩ তারিখের পাথর না মেরে মিনা ত্যাগ করা জায়েয নেই। তখন পাথর না মেরে মিনা ত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে। (মানাসিক পৃ. ২৪৩)

* ১২ তারিখ রাতও মিনায় কাটানো উত্তম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ তারিখ রাত মিনায় কাটিয়েছেন।

* ১২ তারিখের পূর্বে ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের আগে আগে অবশ্যই তাওয়াফ করে নিবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মানাসিক পৃ. ২৩৩)

১৩ তারিখ করণীয়: ১৩ তারিখ মিনায় থাকলে গত দুই দিনের ন্যায় আজও তিনও শয়তানকে পাথর মারতে হবে। ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের পর যারা মিনায় থাকবে, তাদের জন্য ঐ দিনও পাথর মারা ওয়াজিব। ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের পর থেকে যোহর পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করার মাকরূহ সময়। সুতরাং অপারগতা ছাড়া ১৩ই যিলহজ্জ যোহরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করবে না। আর যোহরের সময় শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মাসনূন সময়। সুতরাং এ সময়ের মধ্যেই তিনও শয়তানকে পাথর মারা শেষ করতে হবে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পাথর নিক্ষেপের সময় শেষ। সূর্যাস্তের আগে যদি কেউ পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মানাসিক পৃ. ২৪৪)

বি.দ্র. পাথর নিক্ষেপের জন্য কমপক্ষে (৭+২১+২১+২১) ৭০টি পাথর সংগ্রহ করে রাখলে ভালো। কয়েকটি বেশি সংগ্রহ করে রাখা আরো ভালো। সংগ্রহকৃত পাথর থেকে কিছু যদি বেঁচে যায়, তাহলে অন্য কারো প্রয়োজন হলে তাকে দিতে পারে। অন্যথায় পবিত্র কোনো স্থানে রেখে দিবে। (মানাসিক পৃ. ২৪৪)

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের অন্যান্য আমল: কঙ্কর মারা ও প্রয়োজনীয় কাজের পর বাকী সময় নফল ইবাদতে মশগুল থাকবে। অর্থাৎ যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, দু'আ, দুরূদ ও ইস্তিগফার ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে কিংবা ঘোরা-ফেরা করে এই অমূল্য সময় অপচয় করবে না। ঘোরা-ফেরা এবং গল্প-গুজব করার

জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এই মূল্যবান মুহূর্তগুলো হয়তো জীবনে আর আসবে না। তাই খুব আন্তরিকতার সাথে নফল ইবাদতে মশগুল থাকবে। গুনাহ মাফ করিয়ে নেবে। আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার চেয়ে নিবে। সাথীদের সাথে দীনী মাসাইলের মুযাকারা করবে এবং তা'লীম জারী রাখবে।

১৩ই যিলহজ্জ পাথর মারার পর করণীয়: পাথর মারার পর সামানপত্র সব নিয়ে মক্কায় ফিরে আসবে। মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে 'মুহাস্সাব' নামক স্থানের (বর্তমান নাম 'মুআবাদাহ' যা মক্কার কবরস্থানের পূর্ব দিকে অবস্থিত) মসজিদে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা পড়া উত্তম। এত দীর্ঘ সময় সেখানে থাকতে না চাইলে কিছুক্ষণ অবস্থান করে কিছু দু'আ-দুরূদ পড়ে চলে আসবে। এর দ্বারাও এখানে অবস্থানের একটি সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এখানের অবস্থান শেষে মক্কায় নিজ বাসায় চলে আসবে। (মানাসিক পৃ. ২৫১)

ঋতুবতী মহিলার তাওয়াফে যিয়ারাত (ফরয তাওয়াফ) এর হুকুম: হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। হজ্জের ফরয তাওয়াফের সময় হায়েযগ্রস্ত হলে ফরয তাওয়াফও করতে পারবে না। যদি কোনো মহিলা ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগে এমন সময় পবিত্র হয় যখন গোসল করে তাওয়াফ করা সম্ভব, তাহলে তখনই তাওয়াফ করতে হবে। অলসতাবশত কিংবা অন্য কোনো কারণে না করলে দম দিতে হবে। কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল ও তাওয়াফ করার মত সময় না থাকে, তাহলে দেরি হওয়ার কারণে দম দিতে হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯)

পবিত্র হওয়ার আগেই দেশে ফেরা: যদি কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকার কারণে হজ্জের ফরয তাওয়াফ করতে না পারে, এদিকে পবিত্র হওয়ার আগেই ফিরতি ফ্লাইটের তারিখ এসে যায় এবং কোনোভাবেই তারিখ পিছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে হায়েয বা নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করে নিবে। এর দ্বারা হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে পূর্ণ একটি উট, গরু বা মহিষ দম হিসেবে হারামের সীমানার মধ্যে জবাই করতে হবে। আর এই ত্রুটির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ইস্তিগফার করতে হবে।

সাবধান! ঋতুবতী মহিলা এমন ওযরের সময়ও হজ্জের ফরয তাওয়াফ না করে দেশে ফিরে যাবে না। কারণ তাওয়াফে যিয়ারাত না করে দেশে গেলে আবার মক্কায় এসে তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফ আদায় করার আগ পর্যন্ত স্বামীর সাথে কোনো প্রকার মেলামেশাও বৈধ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৫১৯)

* হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে বিদায়ী তাওয়াফ না করতে পারলে সমস্যা নেই। এ কারণে দমও ওয়াজিব হবে না। কারণ হায়েযের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ মাফ হয়ে যায়। (মানাসিক পৃ. ২৫২)

মিনা থেকে মক্কায় ফিরে করণীয়: মিনা থেকে মক্কায় গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। পুরুষরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারামে পড়ার চেষ্টা করবে। বেশি-বেশি নফল তাওয়াফ করবে। উমরা করতে চাইল তা-ও করতে পারবে। মহিলারা নামাযের জন্য মসজিদে আসবে না। তবে তাওয়াফ বা উমরার জন্য মসজিদে হারামে গেলে মসজিদে হারামের নামাযে শরীক হয়ে যাবে।

বিদায়ী তাওয়াফ: তাওয়াফে যিয়ারাতের পরই বিদায়ী তাওয়াফের সময় শুরু হয়ে যায়। বিদায়ী তাওয়াফের জন্য পৃথক নিয়ত করাও জরুরী নয়। ফরয তাওয়াফের পর কেউ যদি কোনো নফল তাওয়াফ করে তা হলে ঐ তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। দেশে ফেরার আগে বিদায়ের উদ্দেশ্যেই বিদায়ী তাওয়াফ করা উত্তম। নফল তাওয়াফ যেভাবে করা হয় বিদায়ী তাওয়াফও সেভাবে করবে। তাওয়াফ শেষে দুই রাকআত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামায পড়বে। নামায শেষে খুব কান্নাকাটি করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে। এরপর যমযমের পানি পান করবে। বিদায়ের সময় যমযমের পানি পান করা মুস্তাহাব। অতঃপর ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় হারাম শরীফে আগমনের আশা হৃদয়ে ধারণ করে বিদায় নিবে। মীকাতের বাইরে থেকে আগত হাজীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। (মানাসিক পৃ. ২৫২, রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩-৫২৪)

* বিদায়ী তাওয়াফের পরও মক্কায় অবস্থান করা যাবে এবং মসজিদুল হারামে ইবাদতের জন্য যাওয়া যাবে। অবশ্য বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে যেহেতু বিদায়ী তাওয়াফ করা মুস্তাহাব, তাই বিদায়ী তাওয়াফের পরও যদি কেউ মক্কায় অবস্থান করে, তাহলে বিদায়ের প্রাক্কালে পুনরায় বিদায়ী তাওয়াফ করে নেয়া ভালো। (রদ্দুল মুহতার ২/৫২৩)

যিয়ারাতে মদীনা

জেদ্দা থেকে মদীনা সফর : জেদ্দা থেকে বাসে, ছোট গাড়িতে এবং বিমানযোগে মদীনায় যাওয়া যায়। বিমানের ভাড়াও তেমন বেশি নয়। যাদের প্রথমে মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা (আর এটাই উত্তম) তারা ইহরাম বাঁধা ব্যতীত বাড়ি থেকেই মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা করবে। পথে বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। রাস্তায় ২/১ স্থানে গাড়ি থামবে। সেখানে খানা-পিনা, পেশাব-পায়খানা ও উযূ-গোসলের ব্যবস্থা আছে। সেখান থেকে প্রয়োজন পুরা করতে পারবে। কিছু কেনার প্রয়োজন হলে কিনতে পারবে। অতঃপর যখন মদীনা শরীফের অদূরে মদীনার বাসস্ট্যান্ড আসবে, সেখানে কাগজপত্র চেক হবে। বিশেষ করে বাড়ি ভাড়ার ডকুমেন্ট দেখা হবে। চেক সম্পন্ন হওয়ার পর মুআল্লিম অফিস থেকে নির্দিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছানোর জন্য একজন গাইড দেয়া হবে। এখানে চেকিংয়ে কখনো কখনো বেশ দেরি হয়। কাগজপত্র ঠিক থাকলে তাড়াতাড়ি হয়। চেকিংয়ের সময় মুআল্লিম অফিসের ভেতরে পেশাব-পায়খানা, উযূ-গোসল, নামায ও নাস্তার ব্যবস্থা থাকে। এখান থেকে জরুরত পুরা করতে পারবে। আর হজ্জের সফরে যখনই কোনো বাস বা গাড়িতে উঠবে, গুরুত্ব সহকারে গাড়ির নম্বর ডায়রিতে লিখে রাখবে। তাহলে বাস বা গাড়ি খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। গাইড যাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর বাসের ড্রাইভার প্রত্যেককে একটা বিশেষ কার্ড দিবে। এই কার্ড যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করবে। মদীনা শরীফ থেকে ফেরার ২৪ ঘন্টা পূর্বে পাসপোর্ট খুঁজতে এই কার্ড নিয়ে মুআল্লিম অফিসে যাবে। সেখানে তারা এই কার্ড রেখে দিয়ে অন্য কার্ড দিবে। এই কার্ডের মাধ্যমে মক্কায় যাওয়ার বাস পাবে এবং হজ্জের সফর শেষে জেদ্দায় যাওয়ার জন্য মুআল্লিমের বাস পাবে। কাফেলা ছোট হলে একটু অপেক্ষা করে বাসের স্থানে মাইক্রোবাসও নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে পাশের কাউন্টারের লোকদের থেকে বা হজ্জ ক্যাম্পের লোকদের থেকে সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

মদীনায় দ্বিগুণ বরকত: হযরত আনাস রাযি.বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার জন্য দু'আ করেছেন, 'হে আল্লাহ! মক্কায় তুমি যে বরকত দান করেছো, মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করো।' (সহীহ বুখারী ১/২৫৩)

মদীনায় প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না: হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশগণ পাহারায় রয়েছেন, তাই প্লেগ (মহামারী) ও দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।' (সহীহ বুখারী ১/২৫২)

মদীনায় মৃত্যুর ফযীলত: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির মদীনায় মৃত্যু বরণ করা সম্ভব হয়, সে যেন

সেখানেই মৃত্যু বরণ করে, (অর্থাৎ মদীনায় বসবাস করে যাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়) কেননা যে মদীনায় মৃত্যু বরণ করবে তার (ঈমানের) বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দেবো। (ইবনে মাজাহ হা. নং ৩১১২)

যারা হজ্জ করতে যায় তাদের জন্য মদীনা যিয়ারাতে যাওয়া উচিত। অনেকের মতে, যাদের সামর্থ্য আছে তাদের জন্য মদীনায় রওয়া মুবারক যিয়ারাত করতে যাওয়া ওয়াজিব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম-মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যার অন্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম-মহব্বত রয়েছে, সে সুযোগ পেলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারাতে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। যেমন প্রেমিকগণ সুযোগ পেলেই প্রেমাস্পদের কাছে ছুটে যায়।

অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে বিশেষ হায়াতে রয়েছেন। তাঁর কবরের কাছে গিয়ে যারা দুরূদ-সালাম পেশ করে তিনি তাদের দুরূদ-সালাম শুনতে পান এবং তার উত্তরও প্রদান করেন। আর দূর থেকে যারা দুরূদ-সালাম পেশ করে তাদের দুরূদ-সালামও ফেরেশতাগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দেন।

মদীনার উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি

* গোসল করে সুন্নাতী লেবাস পরিধান করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

* নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

* দাড়ি না রেখে থাকলে এখন থেকে দাড়ি রাখার প্রতিজ্ঞা করবে। প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায় যদি দাড়ি ছাড়া আমাকে দেখতেন, তাহলে আমার দিকে কোন দৃষ্টিতে তাকাতেন? তিনি দাড়ি ছাড়া আমাকে দেখে কি মোটেও খুশি হতেন; আর আমিও কি তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ করতে সাহস করতাম?

* বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে। মদীনা সফরে দুরূদ শরীফই একমাত্র ওযীফা। মদীনার যত নিকটবর্তী হতে থাকবে দুরূদ পাঠের পরিমাণ তত বাড়িয়ে দিবে।

* দুই রাকআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমার জন্য মদীনায় প্রবেশ বরকতপূর্ণ করুন। আমাকে সব ধরনের বে-আদবী থেকে হেফাযত করুন। আমাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ ফুয়ূয ও বারাকাত নসীব করুন। এরপর মদীনার সফর শুরু করবে।

মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর করণীয়: মদীনার বাসায় গিয়ে মাল-সামানা গুছিয়ে রেখে গোসল করবে এবং নতুন বা পরিষ্কার পোশাক পরিধান করবে। সাদা কাপড় পরিধান করা উত্তম। খোশবু ব্যবহার করবে। খানার প্রয়োজন হলে খেয়ে নিবে। এরপর ধীরে-সুস্থে মহব্বত, ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা যিয়ারত ও মসজিদে নববীতে নামাযের উদ্দেশ্যে রওনা করবে।

মসজিদে নববীর ফযীলত: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদে নববীতে এক রাকআত নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে একহাজার রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (সহীহ বুখারী হা. নং ১১৯০, সহীহ মুসলিম হা.নং১২৯৪)

* সুনানে ইবনে মাজাহ-এর এক হাদীসে আছে, মসজিদে নববীতে এক রাকআতে পঞ্চাশ হাজার রাকআতের সাওয়াব পাওয়া যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ হা.নং ১৪১৩)

মসজিদে নববীতে প্রবেশ: মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় খুব গুরুত্বের সাথে মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলো আদায় করবে। খেয়াল রাখবে, সুন্নাতওয়ালার দরবারে এসে যেন কোনো কাজ সুন্নাতের পরিপন্থী না হয়। মসজিদে প্রবেশের পর সম্ভব হলে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে রিয়াযুল জান্নাতে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে। ফরয নামাযের সময় হয়ে থাকলে আগে ফরয পড়ে নেবে।

রিয়াযুল জান্নাত: হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউয (কাউসার)-এর উপর।' (বুখারী হা.নং ১১৯৬)

রিয়াযুল জান্নাত-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা:

মসজিদে নববীর বর্তমান মিম্বরের পূর্বপার্শ্ব থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার দেয়াল বা জালি পর্যন্ত স্থানকে 'রিয়াযুল জান্নাত' বলা হয়। মসজিদে নববীতে লাল রঙের কার্পেট বিছানো আছে। আর রিয়াযুল জান্নাতে ছাই ও সাদা রঙ মিশ্রিত কার্পেট বিছানো আছে। ঐ কার্পেট দেখেই রিয়াযুল জান্নাত শনাক্ত করতে পারবে। এই স্থানে সবসময় ভিড় লেগে থাকে। তবুও সুযোগ মতো ওখানে প্রবেশ করে কমপক্ষে দুই রাকআত নামায পড়ার চেষ্টা করবে।

রওযায়ে আতহারে সালাম পেশ: তাহিয়্যাতুল মসজিদ শেষে উভয় জাহানের সরদার, রহমাতুল লিল আলামীন, পেয়ারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে। মনে রাখবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে সালামের উত্তর পেতে হলে এবং তাঁর শাফায়াত লাভে ধন্য হতে হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী জীবন যাপন করা জরুরী। যারা এখনও সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপন শুরু করেনি, তারা রওযায়ে আতহারে উপস্থিত হওয়ার আগেই তাওবা-ইস্তিগফার করে ভবিষ্যতে সুন্নাত মোতাবেক জীবনযাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবে।

সালাম পেশ করার জন্য বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। কাউকে কোনো কষ্ট না দিয়ে- প্রেম-মুহাব্বত, শ্রদ্ধা ও আবেগ ভরা হৃদয় নিয়ে ধীরে ধীরে রওযা অভিমুখে অগ্রসর হবে। এ সময় যত বেশি সম্ভব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দুরূদ শরীফের হাদিয়া পেশ করবে। যখন রওযায়ে আতহারের বড় জালি বরাবর পৌঁছবে, তখন কিবলার দিকে পিঠ করে বড় জালি বরাবর মুখ করে দাঁড়াবে। মনে করবে যেন সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছে, আর তিনিও তাকে দেখছেন। অবনত দৃষ্টিতে হৃদয়ের সবটুকু ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাসহ পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এভাবে সালাম পেশ করবে,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَالْخَلْقِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ.
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ.

এই স্থানে খুব ভিড় থাকায় সালাম পেশ করার জন্য হয়তো বেশি সময় পাবে না। তাই তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে যে কয়টা শব্দ বলতে পারে তা-ই বলবে। শুধু 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' এতটুকু বললেই সালাম আদায় হয়ে যাবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পেশ করার পর সামান্য ডানে সরে এসে তৃতীয় জালির সামনে দাঁড়িয়ে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.কে এভাবে সালাম পেশ করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ لِلّٰهِ جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ

এরপর একটু ডানে সরে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক রাযি.কে

এভাবে সালাম পেশ করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَزَاْكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ

অন্যের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো: কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পৌঁছাতে বলে, তাহলে তার নাম নিয়ে সালাম পৌঁছাবে। এভাবে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে অমুক (উদাহরণত আব্দুল্লাহর পুত্র আব্দুর রহমান) সালাম দিয়েছে।

রওযার সামনে ঈমানের সাক্ষ্য: নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া উচিত। তাই ভিড়ের কারণে প্রথমবার না পারলেও দ্বিতীয়বার যিয়ারাতের সময় রওযার বড় জালির সামনে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে। তখন কালিমায়ে শাহাদাত এভাবে পড়তে পারে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّك عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّك يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ ، فَجَزَاك اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا، جَازَاك اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

(ফাতহুল কদীর ৬/২৪৯)

মদীনায় অবস্থানের দিনসমূহে করণীয়:

ক. পুরুষগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে মসজিদে নববীতে আদায় করবে। হযরত আনাস রাযি. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে এমনভাবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে যে, তার কোনো ওয়াক্তের নামায ছুটবে না, তাকে জাহান্নাম, কবরের আযাব ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির সনদ দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমাদ হা. নং ১২৫৯০)

খ. মহিলাদের জন্য বাসায় নামায পড়াই ভালো, তবে রওযা শরীফ যিয়ারাত করতে আসার সময় কোনো নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে নামায পড়বে।

গ. সম্ভব হলে পুরুষগণ মসজিদে নববীতে কয়েক দিন ই'তিকাফ করবে। পারলে এক খতম কুরআন পড়বে।

ঘ. মদীনার মিসকীনদেরকে বেশি বেশি দান-সদকা করবে।

ঙ. মদীনায় কেউ খারাপ আচরণ করলেও তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে। কোনো রকম বিতর্কে জড়াবে না।

চ. মদীনার অধিবাসীদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ও মহব্বতপূর্ণ আচরণ করবে।

ছ. যখনই সুযোগ হবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা যিয়ারত করবে। তবে নামাযের পরপর যিয়ারাতে না যাওয়া ভালো। কারণ তখন প্রচণ্ড ভিড় থাকে। এছাড়া তখন যিয়ারাত করলে যিয়ারাতটা এক ধরনের গতানুগতিক কাজ হয়ে যায়। তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সময় যিয়ারাত করতে কোনো সমস্যা নেই। মদীনার বাসা থেকে কখনো কখনো শুধু যিয়ারাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে নববীতে যাওয়া ভালো। কেননা এতে যিয়ারাতকে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানানো হয়।

জ. রওযা শরীফের দেয়াল স্পর্শ করা ও চুম্বন করা থেকে বিরত থাকবে।

ঝ. মদীনায় অবস্থানের দিনগুলোতে প্রতিদিন কয়েক হাজারবার দুরূদ শরীফ পড়বে।

ঞ. গুনাহ ও সুন্নাতের খেলাফ কোনো কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে।

ট. কোনো কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে বিক্রেতাকে সহযোগিতা করার নিয়তে কিনবে।

দেশে ফেরার পূর্বের ও পরের কিছু করণীয়: দেশে ফেরার আগে মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীতে (নিজের অবস্থানস্থল হিসেবে) দুই রাকআত নামায পড়বে। নামায শেষে দীন ও দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণের জন্য, হজ্জ ও যিয়ারাত কবুলের জন্য, বারবার বাইতুল্লাহ ও রওযা মুবারকের যিয়ারাত নসীব হওয়ার জন্য এবং সুস্থ ও নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য খুব দিল লাগিয়ে মুনাজাত করবে। এরপর শেষবারের মতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সালাম পেশ করবে (যদি মদীনা থেকেই দেশে ফেরা হয় কিংবা মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়া হয়)। আশেক মা'শুক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় অন্তরের অবস্থা যেমন হয়, নিজের অন্তরের অবস্থা তেমন করার চেষ্টা করবে। রওযা শরীফ থেকে ভগ্ন ও ব্যথিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। দেশে পৌঁছে নিজ এলাকায় প্রবেশের পর এই দু'আটি পড়বে-

أَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

বাসায় প্রবেশের আগে নিজ মহল্লার মসজিদে দুই রাকআত শুকরিয়ার নামায আদায় করবে। যারা ইস্তেকবাল করতে বা দেখা করতে আসবে, বাসায় প্রবেশের আগেই তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে।

হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত: হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যদি নেক কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, হজ্জের আগের জীবন ও পরের জীবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, দীনদারীর অবস্থা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যায়, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হজ্জ কবুল করেছেন। কারণ, এগুলো হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে 'হজ্জে মাবরূর' নসীব করুন। আমীন।

(৪১ পৃষ্ঠার পর; তালাকে তাফবীয)

- স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত যে, তাফবীয প্রদান এবং তালাকে তাফবীয গ্রহণের পূর্বে বিষয়টি কোনো বিজ্ঞ মুফতীর কাছ থেকে বুঝে নেয়া।
- তাফবীয প্রদান করার ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক কোনো শর্তের ভিত্তিতে তাফবীয প্রদান করা এবং অপারগতা না হলে তিন তালাকের তাফবীয না করা।
- তাফবীয প্রদানের ক্ষেত্রে (কাবিননামায় দস্তখতের মাধ্যমে কিংবা মৌখিকভাবে) তা বিবাহের পর সংঘটিত করা, অথবা বিবাহের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা।
- স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো, ভেবে-চিন্তে বিচক্ষণতার সাথে তাফবীযে তালাক গ্রহণ করা, এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া অথবা আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা ষড়যন্ত্রে ব্যবহার না হওয়া।
- তাফবীযের ভিত্তিতে স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণের সময় সরকারি ডিভোর্স লেটারে 'স্বামীকে তালাক প্রদান না করে নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণ করা।
- দাম্পত্য-সঙ্কটের মুহূর্তে তালাকের প্রয়োজন হলে এক তালাকে বায়েনকে যথেষ্ট মনে করা।
- সর্বোপরি দাম্পত্য সঙ্কট এড়ানোর জন্য বিবাহে ইচ্ছুক নারী-পুরুষ এবং তাদের উভয়ের অভিভাবকবৃন্দের করণীয় হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে দীনদার পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা, মেয়ের সম্মান এবং ছেলের সামর্থের দিকে লক্ষ্য করে স্বল্প মোহরানা নির্ধারণ করা, কোনো ধরনের দাম্পত্য-সঙ্কট তৈরি হলে পারস্পারিক সমঝোতা এবং বোঝাপোড়ার মাধ্যমে মীমাংসা করতে চেষ্টা করা, পারতপক্ষে তালাকের পথে না যাওয়া।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈধ সহাবস্থানের বিষয়টিকে সহজ করে দিয়ে যিনা-ব্যভিচারের সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইবলিস-শয়তানের কাজ হলো, বৈধ বিবাহের পথকে সঙ্কটময় করে যিনা-ব্যভিচারের রাস্তা সুগম করে দেয়া। কাজেই আলোচিত মাসআলাটিতে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে মুসলমান জনসাধারণের সচেতনতা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুখময় দাম্পত্য জীবন দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বড়দের জীবন

খাদিমুল কুরআন হযরতুল আল্লাম মাওলানা

ক্বারী রহমতুল্লাহ রহ.-এর জীবন ও কর্ম

মুহাম্মাদ ইবরাহীম রহমত

আশির দশকের কথা। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আদর্শিক সঙ্কটাপন্ন সময়ে একজন আল্লাহওয়ালা বিদগ্ধ আলেমে দীন তওবার আন্দোলন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অবর্তীর্ণ হন। 'হাফেজ্জী হুযূর' নামে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়ে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে আমি বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামে আটষট্টি হাজার মকতব প্রতিষ্ঠা করব। নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হতে পারেননি; কিন্তু তার স্বপ্ন অপূর্ণ থাকেনি। বাংলার আটষট্টি হাজার গ্রামে আটষট্টি হাজার মকতব ঠিকই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার স্বপ্ন পূরণের পথে পুরো বাংলাদেশে সহজ ও সুবিন্যস্তভাবে কুরআন শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের জন্য দুইজন ব্যক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি। একজন ক্বারী মাওলানা বেলায়েত হুসাইন রহ.। অপরজন ক্বারী মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.। আল্লাহ তা'আলা তাকে (রহমতুল্লাহ রহ.) কুরআনের এই সুমহান খেদমতের জন্য তার যুগের আহলে দিল যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ উস্তাযদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছেন। যাদের অন্যতম হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. ও মুজাহিদে আ'যম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.। তাঁরা ছিলেন এদেশের সর্বজনস্বীকৃত বুযুর্গ ও মাননীয় ব্যক্তিত্ব। কুরআনের ভালোবাসায় তারা ছিলেন সদা তপ্তহৃদয়। এমন মহান ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.। তিনি ছিলেন কুরআনের আশেক ও পাগলপ্রেমিক। অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী তিনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষার আলো বিলিয়েছেন সারা বাংলায়। সেই সুবাদে দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে তার অগণিত ছাত্র, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতধন্য 'রহমতুল্লাহ' নামটি আজ তাই বহু পরিচিত। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী শ্যামবর্ণের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সেই মানুষটি আজ ইহধাম ত্যাগ করে মাওলা পাকের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জিঊন।

বহু বুযুর্গের সোহবতধন্য, 'নূরানী কুরআন শিক্ষা ও নূরানী মু'আল্লিম প্রশিক্ষণ আন্দোলনের অগ্রপথিক হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. সম্পর্কে জানার আগ্রহ বহুজনের। কিন্তু তার বিস্তারিত জীবনী সংকলন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

জন্ম ও পরিচয়

নাম : রহমতুল্লাহ। পৈত্রিক বাড়ি চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত শাহরাস্তি থানায়। শাহরাস্তির একটি গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর বা ইবরাহীমপুর। এই ইবরাহীমপুরের অধিবাসী জনাব মৌলবী ওয়ালিউল্লাহ সাহেব রহ.-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ। মায়ের নাম শামছুন্নাহার। দুই ভাই ও এক বোনের মাঝে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তার জন্ম। এ সময়টি ছিল ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরা ভারত উপমহাদেশের মাটি দখল করে ইসলামী শিক্ষা বিলুপ্ত করে মানুষের ঈমান ধ্বংসের ব্যবস্থা করছিল। অপরদিকে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন ক্রমে দানা বাঁধছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর শিক্ষার হাতেখড়ি পিতা মরহুম মৌলবী ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের নিকট। ১০বছর বয়স পর্যন্ত তার কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তখন তার পিতা মৌলবী ওয়ালিউল্লাহ রহ. ঢাকা'র ধামরাই থানার এক জামে' মসজিদে ইমাম হিসেবে দীনি খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে তার পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে ১০বছর বয়সেই তিনি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি সেখান থেকে নিজ জেলা চাঁদপুরে চলে আসেন। তিনি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করেন। অতঃপর সেখানে প্রসিদ্ধ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জাফরাবাদ মাদরাসা'য় ভর্তি হন। এখানে তার আপন চাচাত ভাই হযরত ক্বারী বেলায়াত হুসাইন সাহেব রহ. শিক্ষক হিসেবে ছিলেন আগে থেকেই। তিনি তার এই এতীম ছোট ভাই রহমতুল্লাহ'র দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। তারই তত্ত্বাবধানে সেখানে তিনি জামা'আতে নাহবেমীর পর্যন্ত লেখা-পড়া করেন।

বাল্যকালের একটি দুর্যোগ এবং খোদায়ী নুসরত

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর প্রতিপালন দীনী পরিবেশে হওয়ার সুবাদে তার মাঝে বাল্যকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিলো। ১৯৪৯ সালে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের কথা অনেকেরই মনে আছে। তখন মাওলানা রহমতুল্লাহ মাত্র বারো বছরের কিশোর। ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছিল রাত থেকেই। তাদের থাকার ঘরটি ছিলো বাড়ির অন্যসকল ঘরের তুলনায় দুর্বল। ফলে ঘরটি বাতাসে উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। হেলতে থাকলো। তার আম্মা বলতে লাগলেন–চলো, আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে অমুকের ঘরে চলে যাই। কিন্তু বারবার পীড়াপীড়ির পরও তিনি বের হলেন না; শান্ত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ বাঁচালে এখানেই বাঁচাবেন। আর আল্লাহ মারলে যেখানেই যাই সেখানেই মারবেন। পরিশেষে তার আম্মা তার বড় বোনকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। আর বালক রহমতুল্লাহ একাকী ঘরে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। সারারাত্রির তাণ্ডব শেষে সকালে ঝড় থামলো। দেখা গেলো, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘর ও গাছপালা সব তছনছ হয়ে গেছে। কেবল বালক রহমতুল্লাহর ঘর ঝড়ে যতটুকু বাঁকা হয়েছিলো, তা-ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় আশপাশের সকল মানুষ ছোট্ট এই বালকের ঘরে এসে আশ্রয় নিলো।

উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকার পথে যাত্রা

১৯৫৫ সালে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগে' ভর্তি হন। সে সময় লালবাগ মাদরাসা উপমহাদেশের বড় বড় ইলমী ব্যক্তিত্বের পদচারণায় ইলমের মারকায এবং ঢাকার সেরা মাদরাসা হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিলো। এ মাদরাসায় তখন হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর বড় বড় তিনজন খলীফা শিক্ষাদান করতেন। তাদের একজন হাকীমুল উম্মাত থানবী রহ.-এর ভাগিনা 'আহাদীসুল আহকাম' সম্পর্কে লিখিত বৃহৎ কলেবরের বিখ্যাত কিতাব 'ই'লা-উস্

সুনান'-এর লেখক আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ.। দ্বিতীয়জন সমাজ সংস্কারক মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব) রহ.। অপরজন ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযূর) রহ.। তিনি এই মহামনীষীগণের নিকট নিজেকে সোপর্দ করেন। তাদের খেদমত ও সাহচর্যে দীর্ঘদিন অধ্যয়নে রত থেকে ১৯৬৫ সালেন বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) সমাপ্ত করেন।

উলূমে তাফসীর অর্জন:

১৯৬৬ সালে মুরুব্বীদের দিকনির্দেশনায় লালবাগ মাদরাসায় 'উলূমে তাফসীর' বিভাগে ভর্তি হন। ঐ বছরই আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.-এর নেতৃত্বে লালবাগ মাদরাসার দশজন উস্তায ও একজন ছাত্র সারাদেশে ইলমী সফরে বের হন। আর সেই একজন ছাত্রই ছিলেন মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.।

বিখ্যাত উস্তাযবৃন্দ

১. আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.
২. আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব হুযূর) রহ.
৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযূর) রহ.
৪. আল্লামা হিদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর) রহ.
৫. শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.
৬. মুফতী হারূন রহ.
৭. মুফতী দীন মুহাম্মাদ রহ.
৮. মুফতী আবদুল মুঈয রহ.
৯. হাফেয মাওলানা আব্দুল কবীর রহ.
১০. মাওলানা আবদুল মাজীদ (ঢাকুবী হুযূর) রহ.
১১.মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব রহ.
১২.ক্বারী বেলায়েত হুসাইন সাহেব রহ.

ছাত্রবৃন্দ

তার শিক্ষার অবদান নূরানী পদ্ধতিতে তা'লীমুল কুরআনের প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেম-উলামা মাদরাসার ছাত্র-উস্তাদ তার ছাত্র। কেননা নূরানী শিক্ষা বলতে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দুই ব্যক্তির নূরানী শিক্ষাসিলেবাস প্রচলিত। এক. ক্বারী মাওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেব রহ. এর নূরানী সিলেবাস। দুই. ক্বারী মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব রহ. প্রণীত নূরানী শিক্ষা সিলেবাস। আর বলাবাহুল্য, সবাই নূরানী শিক্ষা সমাপন করেই দীনী ধারার উচ্চশিক্ষার পথে অগ্রসর হন। তবুও সরাসরি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যারা উপকৃত হয়েছেন বর্তমানে বিখ্যাতজনদের মধ্যে এঁদের সংখ্যাও কম নয়।

কর্মজীবন

লেখাপড়া সমাপ্ত করার পরপরই তিনি ১৯৬৬ সালের রমযান মাসে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর সঙ্গে ই'তিকাফ করেন। এতে তার ইলমী ও আমলী অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রমযানের পর হাফেজ্জী হুযূর রহ. তাকে 'জামিআ নূরিয়া কামরাঙ্গীরচর'-এর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। তখন মাদরাসাটি 'কাফিয়া জামাআত' পর্যন্ত ছিলো। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পর্যন্ত তিনি জামা'আতে কাফিয়ার ছাত্রদেরকে একাই সকল কিতাবের দরস প্রদান করেন।

সেখানে একবছর শিক্ষকতার পর হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর পক্ষ হতে একটি পত্র আসে। পত্র পাঠ করে তিনি জানতে পারেন, তৎকালীন খুলনার (বর্তমান গোপালগঞ্জ) গওহরডাঙ্গা মাদরাসার জন্য একজন 'মুহাদ্দিস' আবশ্যক। ফরিদপুরী রহ. তাকে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় যান এবং মুহাদ্দিস হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখানে তিনি সুনানে আবূ দাঊদ,তাফসীরে বাইযাবী, হেদায়া, শরহে তাহযীব, কাফিয়া'র মতো জটিল কিতাবসমূহের দরস প্রদান করেন।

হযরত সদর সাহেব রহ. তাকে অনেক ভালবাসতেন। হযরতের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতো প্রগাঢ় ছিলো যে, হযরত নিজে উদ্যোগী হয়ে তার খোঁজ খবর নিতেন। বাজারে গিয়ে পছন্দনীয় মাছ-তরকারী কিনে একভাগ নিজের বাসায় পাঠাতেন, আরেকভাগ ব্যক্তিগত খাদেমকে দিয়ে তার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তাই তিনি প্রায়ই হযরত সদর সাহেব রহ.-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বলতেন, "সদর সাহেব রহ. আমাকে বে-ইন্তেহা মহব্বত করতেন, তার কাছে আমি এতো স্নেহ-মমতা পেয়েছি যে, সম্ভবত আমার বাবা-মা'র কাছেও অতটা স্নেহ-মমতা পাইনি।" ১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে হযরত সদর সাহেব রহ. ইন্তিকাল করেন। এতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন।

এদিকে খুলনা আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে তাকে আহ্বান জানানো হয়। তিনি তাতে সাড়া দিয়ে সেখানে চলে যান। দুই বছর সেখানে হাদীসের খেদমত করার পর দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরিস্থিতি অনেক নাযুক হয়ে পড়ে। ফলে সেখানে তাকে কিছুদিন কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

বিবাহ

চাঁদপুর জেলার উজানী থানার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ক্বারী ইবরাহীম সাহেব রহ.-এর সুযোগ্য খলীফা ছিলেন ক্বারী সবর আলী রহ.। তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা ক্বারী সফিউল্লাহ সাহেব রহ.। যিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'জামিয়া ইউনুছিয়া'য় দীর্ঘদিন যাবত নাহব-ছরফের ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারই দ্বিতীয় কন্যা মুহতারামা মুবাশ্শিরা খাতুনের সঙ্গে ১৯৬৭ সালে মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি তিন বছর ফরিদপুরের একটি মাদরাসায় শিক্ষকতার খেদমত আঞ্জাম দেন।

তারপর তার জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে পবিত্র কুরআনের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে কবুল করেন। তার চাচাত ভাই ক্বারী বেলায়েত হুসাইন সাহেব রহ. তাকে এই খেদমতে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি কুরআনুল কারীম শিক্ষাদান সহজীকরণে নূরানী পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার দক্ষ দিকনির্দেশনায় মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. নিজেকে কুরআনের খেদমতে সোপর্দ করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু করে ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষাদানের খেদমত করে গিয়েছেন।

কষ্টের একটি চিত্র

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-কে শিক্ষাদানের গতানুগতিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্নধারায় বয়স্কদের মাঝে কুরআনে কারীমের খেদমতের লক্ষ্যে নূরানী পদ্ধতির সূচনার জন্য অনেক কুরবানী মেনে নিতে হয়েছিলো। ঘরে ঘরে কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করার জন্য বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ চষে বেড়াতে হয়েছিলো। সেই সুবাদে ১৯৭৫ সালে তিনি নোয়াখালী জেলার মুজাহিদপুর মাদরাসায় 'নূরানী মু'আল্লিম ট্রেনিং'-এর খেদমতে ছিলেন। তখন ইতিহাসবিখ্যাত ৭৫'র দুর্ভিক্ষ চলছিলো। অভাব অনটনের মাত্রা এতো বেশি ছিলো যে, বহু মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছিলো। মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর পরিবারেও খুব অভাব-অনটন চলছিলো। তখন তার পরার মতো শুধু একটি জামা ও একটি লুঙ্গি ছিলো। তিনি গামছাটি পরিধান করে গোসল করতেন। একবার পারিবারিক অবস্থা করুণ আকার ধারণ করলো। তার আম্মা ও পরিবার-পরিজন সারাদিন উপবাস। খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছিলো না। হঠাৎ তার মনে উদয় হলো যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিজের ব্যাপারে চাই না বিধায় তুমি কি আমার অবস্থা দেখ না? রাতে তাহাজ্জুদের পর কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহর কি রহমত! সকালে তিনি হাঁটছিলেন। হঠাৎ এক

আগন্তুক এসে তাকে কিছু হাদিয়া পেশ করলো, যা তার পারিবারিক ও অন্যান্য প্রয়োজনেও যথেষ্ট হয়েছিলো। সুবহানাল্লাহ।

অবদান

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এদেশে কুরআন ও দীনের অসংখ্য খেদমত নিয়েছেন। 'নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্‌ফ এস্টেট' ও 'জামিআ নূরানিয়া, তারাপাশা, কিশোরগঞ্জ' তার খেদমতের স্মৃতিচিহ্ন। নিমগ্ন খেদমতের কারণে যখন তার সুনাম সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখনো তার মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-দৌলত ও চাকচিক্যের মোহ জায়গা করে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়; এগুলোর প্রতি যেন তার সামান্য পরিমাণেও টান অনুভূত না হয় এবং কারো যেন তার ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ ও লেনদেনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেননি এবং চোখের সামনে তাঁর জানামতে কোথাও এক পয়সার খেয়ানত হতে দেননি।

কিশোরগঞ্জ আগমন ও 'মাদরাসায়ে বাগে জান্নাত' প্রতিষ্ঠা

কিশোরগঞ্জবাসী যে সকল বুযুর্গের মেহনতের বদৌলতে দীনী শিক্ষা পেয়েছে, হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. তাঁদের অন্যতম। ১৯৭৭ সালে আলহাজ্জ মুফিজুদ্দীনসহ কিছু দীনদার মানুষ ক্বারী বেলায়াত সাহেব রহ.-এর কাছে আবেদন করলেন, তিনি যেন কুরআন শিক্ষার বয়স্ক ক্লাসের জন্য একজন অভিজ্ঞ মু'আল্লিম প্রেরণ করেন। সে সময় বেলায়েত সাহেব রহ. ক্বারী মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব রহ.-কে কিশোরগঞ্জ পাঠান। তিনি তার নির্দেশে কিশোরগঞ্জ এসে মেহনত শুরু করেন। অল্পদিনে তার মেহনতে বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ কুরআন শিক্ষার জন্য ছুটে আসতে থাকে। একপর্যায়ে ১৯৭৭ সালে তিনি ঐতিহাসিক 'শোলাকিয়া মাঠে'র উত্তর পাশে প্রতিষ্ঠা করেন 'মাদরাসায়ে নূরিয়া বাগে জান্নাত'। যা আজও উক্ত নামে প্রসিদ্ধ। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তার সুনাম সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছু দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে কিশোরগঞ্জ থেকে চলে আসতে হয় রাজধানী ঢাকায়।

জামে' মসজিদে ইমামতি

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. কিশোরগঞ্জ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকা রামপুরা জামে' মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যেহেতু কুরআনের শিক্ষক ছিলেন, তাই কেবল ইমামতিতে স্থির হননি; বরং সেখানে নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার একটি ক্লাস খুললেন। সেখানে তার ক্লাসে অনেক মানুষ কুরআন শিক্ষার জন্য অংশগ্রহণ করেন। যদ্দরুণ তা এক কুরআন শিক্ষার মারকাযে পরিণত হয়।

পুনরায় কিশোরগঞ্জ আগমন ও জামিআ নূরানিয়া প্রতিষ্ঠা

ঢাকায় কিছুদিন অবস্থানের পর কিশোরগঞ্জের তারাপাশা (বয়লা) এলাকার আলহাজ্জ মুতিউর রহমানসহ কিছু দীনদার লোকের আবদার রক্ষার্থে পুনরায় তিনি কিশোরগঞ্জে আগমন করেন। এ সময় মরহুম আলহাজ্জ মুতিউর রহমান সাহেব তাকে সাড়ে বায়ান্ন শতাংশ জায়গা 'কুরআন শিক্ষার একটি মাদরাসা' প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন।

কুরআন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখে তিনি বৃহদাকারে একটি মাদরাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের লক্ষ্যে দাওয়াত করেন হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-কে। তিনি আসতে সম্মতি জানান।

১৯৮৩ সনের ২২ অক্টোবর হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর হাতে এ মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছিলো 'নূরানী মাদরাসা ও ট্রেনিং সেন্টার'। হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর কঠোর শ্রম-সাধনা আর ইখলাসের বদৌলতে মাত্র কয়েক বছরেই মাদরাসাটির সুনাম-সুখ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় হাজারো ছাত্রের সমাগম হয় এ মাদরাসায়। ফলে ২০১১ সালে তা 'জামিআ নূরানিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে। ২০১৫ সালে দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) এর মুবারক দরস শুরু হয়।

'নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্‌ফ এস্টেট' প্রতিষ্ঠা

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. স্বাধীনতার কিছুদিন পর থেকেই ক্বারী বেলায়েত সাহেব রহ.-এর সঙ্গে কুরআনে কারীমের 'নূরানী পদ্ধতি'র মিশন নিয়ে সম্পৃক্ত হন। তৎকালীন মুরব্বীগণ উক্ত পদ্ধতির প্রচার-প্রসারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর 'নূরানী পদ্ধতিতে অল্পসময়ে কুরআন শিক্ষা'র বয়স্কক্লাসের ছাত্র ছিলেন আলহাজ্জ আবদুল মালেক সাহেব রহ.। হাজী সাহেব রহ. ছিলেন দীনদরদী মানুষ। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেমন টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন; সেগুলোকে দীনের পথে নিঃশেষ করার মতো বিশাল একটা হৃদয়ও দান করেছিলেন। তাই তিনি বাংলাদেশের অনেক বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় দু'হাত খুলে অকাতরে দান করে গিয়েছেন। তিনি মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেবে'র সবকে উদ্বুদ্ধ হয়ে পবিত্র কুরআন শিক্ষার খেদমতের জন্য তার কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে দেন। ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্জ আবদুল মালেক সাহেব রহ.-এর প্রস্তাবে তখন তার ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির উপর 'নূরানী পদ্ধতিতে কুরআনুল কারীমের খেদমতে'র জন্য ১৯৮৪ সালে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, যা 'নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্‌ফ এস্টেট' নামে সুপ্রসিদ্ধ।

শুরুর দিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুরব্বী হিসেবে ক্বারী বেলায়াত সাহেব রহ.-ই ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬/৮৭ সালে মুতাওয়াল্লী কমিটির সাথে হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়াত সাহেব রহ.-এর দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় তিনি 'ওয়াক্‌ফ এস্টেট' থেকে চলে যান। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বভার পড়ে মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর ওপর।

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন প্রতিষ্ঠা

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মালেক সাহেব রহ.-এর ইন্তিকাল হয় ২০০২ সালে। তার ইন্তিকালের পর মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. 'নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্‌ফ এস্টেট' পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন। হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব অর্পিত হয় তার পুত্র ডা. আব্দুল কাইয়ুম সাহেবের ওপর। চূড়ান্ত বার্ধক্যে এসে ২০১৫ সালের শেষের দিকে মাওলানা রহমতুল্লাহকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। এতে তিনি অনেক ব্যথিত হন। কুরআনের খাদেম হিসেবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য অতঃপর তিনি 'বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন' নামে নূরানীর আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার পুরুষ শাখা ও মহিলা শাখা উভয়টিই রয়েছে। কেন্দ্র অস্থায়ীভাবে ঢাকা উদ্যানে অবস্থান করছে।

বুখারী শরীফের দরস প্রদান

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কিশোরগঞ্জ জামিআ নূরানীয়া'য় আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ.-এর সনদে সহীহ হাদীসের বিখ্যাত কিতাব বুখারী শরীফের দরস প্রদান করেন। এর মাধ্যমে তিনি তার পৃথিবী সেরা উস্তাদদের থেকে প্রাপ্ত ইলমে হাদীসের মীরাস ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে যান।

আত্মশুদ্ধি: বায়আত ও খিলাফত

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. ছাত্রজীবনেই আত্মশুদ্ধির জন্য শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. ও হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর কাছে নিজেকে সঁপে দেন। হযরত সদর সাহেব রহ.-এর সোহবতে ১২ বছর এবং হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর সোহবতে প্রায় ৩০ বছর অতিবাহিত করেন। এই

ত্রিশ বছর তিনি নিয়মিত হাফেজ্জী হুযূরের সঙ্গে ই'তিকাফ করেন। অতঃপর হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর সঙ্গে পুনর্বার এই শর্তে বায়আত হন যে, 'একজন অপরজনকে ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবেন না'।

এমনিভাবে হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, "কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– হে আজিজুল হক, তুমি আমার জন্য কী নিয়ে এসেছো? তখন আমি আল্লাহর দরবারে রহমতুল্লাহ ও মনসূরুল হককে পেশ করে বলবো হে আল্লাহ, আমি এদেরকে গড়ে এনেছি!"

মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. বলতেন, এই সমস্ত বুযুর্গদের সোহবতই আমাকে দীনের মহান এই খেদমতে পদে পদে সহযোগিতা করছে।

একবার হাফেজ্জী হুযূর রহ. কিশোরগঞ্জ আগমন করলে মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-এর মাদরাসায় রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর সকালে ময়মনসিংহে এক মাহফিলে যাওয়ার পথে তাঁকেও সঙ্গে নিতে চান। কিন্তু তিনি ওযরের কারণে যেতে পারলেন না। তখন ময়মনসিংহ গিয়ে হাফেজ্জী হুযূর রহ. বললেন, "রহমতুল্লাহকে তো খেলাফত দেওয়ার জন্য আনতে চেয়েছিলাম; সে তো আসলো না।"

হযরত রহমতুল্লাহ রহ.-কে খেলাফত প্রদান করেন লক্ষীপুরের হযরত মাওলানা আবদুল আজীজ (জনাবওয়ালা) সাহেব রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান, হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর বিশেষ খলীফা, লালবাগ জামিয়ার মুহাদ্দিস– আল্লামা আব্দুল কবীর রহ.। এছাড়া সমকালীনদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে খেলাফত প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে যাত্রাবাড়ির হযরত (আমীরুল উমারা) মাহমূদুল হাসান সাহেব দা. বা. অন্যতম।

ইখলাস ও অল্পেতুষ্টির নমুনা

আর্থিক অস্বচ্ছলতার সময় ১৯৮৩ ইং থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এই দুই বছরই কেবল তিনি 'জামিআ নূরানীয়া' থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জামি'আ থেকে কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি। ১৯৮৪ সালে 'নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্ফ এস্টেট' গঠন হওয়ার পর সেখান থেকে বেতনভাতা প্রাপ্ত হন।

তিনি নিজেকে খুব ছোট মনে করতেন। কখনো নিজেকে বড় মনে করতেন না। তার বিভিন্ন সময়ের আচরণে-উচ্চারণেও তা বেশ ফুটে উঠতো। একবার মিরপুর দারুস সালাম মাদরাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হাকীম কাসেমী সাহেব তাঁকে দেখতে কিশোরগঞ্জ গেলে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, تسمع بالمعيدي خير من أن تراه মু'আইদীকে (তার সাহিত্য প্রতিভার কারণে মুগ্ধ হয়ে) দেখতে আসার চেয়ে তার কবিতা-সাহিত্য শুনে খুশি থাকা উত্তম। কেননা তার সাহিত্য হৃদয়গ্রাহী বটে; কিন্তু তার চেহারা সূরত কদাকার। আমিও হলাম সেই মু'আইদী। লোকেরা আমার নাম-যশ শুনে দূর থেকে আমাকে দেখতে আসে; কিন্তু আমার মধ্যে তো কিছুই নাই। "বুখারীর দরসে তাই নিজের অতীতকে স্মরণ করে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একদিন বলেন, 'শোন, আমি তো সেই রহমতুল্লাহ, যে দু'পয়সা দিয়ে এক টুকরো রুটি ক্রয় করে খেতে পারতো না'।

বাইতুল্লাহর মেহমান

যে ঘরের দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ি, তা যেন একবার হলেও চর্মচোখে দর্শন করতে পারি, এটাই প্রতিটি মুমিনের দিলের একান্ত কামনা। মা'শুকের দরবারে না যেতে পারার কষ্ট সর্বদাই আল্লাহর ওলীদেরকে অস্থির করে রাখে। হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ. তো ছিলেন একজন খাঁটি আল্লাহর ওলী। তাই বাইতুল্লাহয় হাজির হওয়ার জন্য তার হৃদয়-মন অস্থির হয়ে থাকতো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে ১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ২০০২ সালে পরপর তিনবার বাইতুল্লাহর মেহমান হয়ে হজ্জ পালন করে মনের তৃপ্তি মেটান। কোন এক হজ্জের সফরে জান্নাতুল বাকীতে বসে 'ফাযায়েলে কুরআন' নামক একটি কিতাব রচনা করেন। কিন্তু তা সফরেই হাতছাড়া হয়ে যায়।

দাওয়াত ও তাবলীগ

দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানেও তার বিশেষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। ইলমী খেদমত তথা কুরআন শিক্ষা ও মাদরাসা পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় তাফসীর করাসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে দীনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে মেহনত চলছে বিশ্বময়–সেই মহান কাজেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সনে ভারত সফর করেন। ৪০ দিন সেখানে অবস্থান করে দাওয়াতের মেহনত করেন।

ইন্তিকাল

১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৮১ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে দেশ ও জাতিকে তিনি অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন। চাকচিক্যময় দুনিয়ার মায়া ও লালসার মাঝে নিজেকে না জড়িয়ে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় একটি জাতিকে কুরআনের বিশুদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গেছেন। অবশেষে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১১ তারিখ সোমবার সকালে কিশোরগঞ্জের নিজ বাসায় ব্রেইনস্ট্রোক করার পর অবস্থা অবনতির দিকে গেলে তাঁকে দ্রুত থানা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তারদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে ঢাকায় এনে আগারগাঁওস্থ নিওরো সাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুইদিন দুইরাত অজ্ঞান অবস্থায় ডাক্তারদের নিবিড় পরিচর্যায় অতিবাহিত করার পর জুন মাসের ১৪ তারিখ মোতাবেক ২৮ রমযান ১৪৩৯ হিজরী বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৩৮মিনিটে ধীরে ধীরে জীবনের শেষ তিনটি শ্বাস নেন। তারপর কুরআনের এই খাদেম কুরআনের মাসেই রব্বে কারীমের মোলাকাতের জন্য চিরতরে এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

পরিবার

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা তিনজন পুত্র এবং চারজন কন্যা সন্তান দান করেছেন। বড় পুত্র আবুল হাসান ছোট বয়সেই ইন্তিকাল করেন। অতঃপর দুই পুত্র দীনী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে বর্তমানে দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। আর চার মেয়ের সবাইকে তিনি আলেম স্বামীর কাছে বিয়ে দিয়েছেন। তারাও সবাই দীনী খেদমতের সাথে লেগে আছেন। ইন্তিকালের সময় তিনি তার সহধর্মিনী, দুটি পুত্র ও চারটি কন্যা রেখে যান। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে তার মৃত্যুর আগেই তিনি তার পরিবারের মধ্যে ১৮ জন হাফেজে কুরআন রেখে যাওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

রচনাবলী

১. পবিত্র কুরআন ও দীন শিক্ষার নূরানী পদ্ধতি (দুই খণ্ডে সমাপ্ত)
২. নূরানী পদ্ধতিতে অল্পদিনে কুরআন শিক্ষা
৩. নূরানী কায়দা
৪. মাতৃজাতির মর্যাদা
৫. ফাযায়েলে কুরআন (অপ্রকাশিত)
৬. জীবনের পণ

আল্লাহ তা'আলা তার জীবনের সমস্ত খেদমতকে কবুল করে নিন এবং তার পরিবারবর্গের মধ্যে তার উত্তম স্থলাভিষিক্ত তৈরি করে দিন। আমীন।

**লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
দৌহিত্র, মাওলানা রহমতুল্লাহ রহ.**

তালাকে তাফবীয

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

তাফবীযে তালাকের প্রয়োজনীয়তা ও পরিচয়

ঘটনা : বর-কনে উভয়ের পরিবারের পূর্ণ সম্মতিতে ঘরোয়া পরিবেশে এক দম্পতির বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত বাসর রাতে ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। স্বামী তার বাসর ঘরে আমন্ত্রণ জানায় ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের। স্ত্রীর সঙ্গদানের পরিবর্তে স্বামী পুরুষটি তার বন্ধুদের নিয়ে মদপানের আসর বসায় বাসর ঘরে। স্বামীর পবিত্র সংস্পর্শের পরিবর্তে 'অপবিত্র' স্পর্শের ভয়ে স্ত্রী অজানা ভয় ও শঙ্কায় প্রমাদ গুণলো এবং পরিশেষে কোনোভাবে নিজের সম্ভ্রম নিয়ে বাসর ঘর থেকে পালাতে বাধ্য হলো। এখন অসৎ স্বামী তাকে কেবল উপভোগের বস্তু বানাতে চায়। কিন্তু সে যদি এ সংসার করতে না চায়, তবে...? আদালতের আশ্রয়ে মুক্তির আশায় সে স্বামীকে ডিভোর্স লেটার পাঠালো, যাতে লেখা আছে 'স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক'! এতে স্ত্রী কি আদৌ মুক্তি লাভ করেছে?

দীনী শিক্ষার অভাব এবং অনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থায় এ জাতীয় ঘটনা এখন নিত্যদিনের রোজনামচা! সঙ্কটময় দাম্পত্যজীবনের নেপথ্যে কখনো থাকে স্ত্রী কিংবা স্ত্রী-পক্ষের অগ্রণী ভূমিকা, আবার কখনো থাকে স্বামীর অসততা বা অনৈতিকতা।

পত্রিকার পাতা খুললে দাম্পত্য-জটিলতার এমন অনেক ঘটনাই নিত্য দৃষ্টিগোচর হয়, যেখানে একজন নারী তার সংসারজীবনে বিভিন্ন টানাপোড়েনের শিকার হয়ে থাকে। কখানো স্বামীর নেশাখোর হওয়া বা চরিত্রহীন হওয়ার কারণে, কখনো দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে তাকে অসহায় ফেলে লাপাত্তা হয়ে যাওয়া কিংবা জুলুম-নির্যাতন করার কারণে। আবার কখনো পরকীয়ার রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে। যদ্দরুণ স্ত্রীর পক্ষে উক্ত স্বামীর সঙ্গে সংসারজীবন পরিচালনা করা বাস্তবতার নিরিখে আর সম্ভবপর থাকে না। সে বাধ্য হয় দাম্পত্যজীবনের ইতি টানতে। দাম্পত্যসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে সাধারণত একজন অসহায় স্ত্রী সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে চার ধরনের পন্থা গ্রহণ করে থাকে-

১. তালাক প্রদানের ব্যাপারে স্বামীকে সম্মত করার চেষ্টা করা।
২. অর্থের বিনিময়ে বা মোহরের দাবী ছেড়ে খোলা তালাক গ্রহণ করা।
৩. আদালতের শরণাপন্ন হওয়া।
৪. তালাকে তাফবীযের মাধ্যমে তালাক গ্রহণ করা।

কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রথম তিনটি পন্থার প্রত্যেকটিতেই কিছু জটিলতা রয়েছে। যেমন-

অনেক সময় 'নারী ও শিশু নির্যাতন' আইনে কনেপক্ষ মামলা করবে এ ভয়ে কিংবা বিবাহের সময় ধার্যকৃত অধিক মোহর আদায় করার ভয়ে অথবা যৌতুকের লোভের বশবর্তী হয়ে কিংবা অন্য কোনো চারিত্রিক অসততার কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে সম্মত হয় না।

খোলা তালাক গ্রহণ করতে অনেক সময় স্ত্রীপক্ষ সম্মত হয় না। কেননা, খোলা তালাক অর্থের বিনিময়ে করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত খোলা তালাক সাধারণত পূর্বধার্যকৃত মোহর মাফ করে দেয়ার শর্তে হয়ে থাকে। আর আমাদের সমাজে যেহেতু অনেক সময় বিবাহে (স্বামী কর্তৃক মোহরানা আদায়ের সদিচ্ছা এবং তার সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে) কেবল এজন্য অধিক মোহরানা ধরা হয়, যেন তা আদায় করার ভয়ে স্বামী কখনো উক্ত স্ত্রীকে তালাক না দেয়! ফলে স্বামী যেমন অধিক মোহরানা আদায়ের ভয়ে তালাক দিতে সম্মত হয় না, তেমনি স্ত্রীপক্ষও মোহরানা মাফ করে দেয়ার শর্তে খোলা তালাক গ্রহণে সম্মত হয় না। কেননা এতে স্ত্রীর জন্য সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি রয়েছে।

আদালতের শরণাপন্ন হলে ক্ষেত্রবিশেষে সময়ক্ষেপণ বা অর্থনৈতিক ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের আইনী জটিলতা তো রয়েছেই, তেমনি অনেক সময় বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান করা হয়! অথচ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান করলে তা কোনোভাবেই কার্যকর হবে না; বরং বিবাহ পূর্ববৎ বহাল থাকবে। (মাজমাউল আনহুর ১/৫৪৫, ফাতাওয়া শামী ৩/১৯০, ৩২৬, উমদাতুর রিআয়াহ ৩/১৯৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৯/১১৯)

স্ত্রীর জন্য এ ত্রিমুখী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের নিমিত্তে ইসলামে রয়েছে স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বিবাহপূর্ব সতর্ক পদক্ষেপের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকের বিষয়টিকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা এ বিচ্ছেদ অনেক সময় দাম্পত্যজীবনের চলমান সঙ্কট থেকেও অধিক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে স্বামীকে যেমন তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তেমনি পূর্বসতর্কতার ভিত্তিতে প্রয়োজনের মুহূর্তে শর্তসাপেক্ষে স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণ করার অবকাশও ইসলামে রয়েছে। আর স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণের অবকাশের সে স্বীকৃত পন্থা হলো তালাকে তাফবীয।

তালাকে তাফবীযের পরিচয়

শর্তসাপেক্ষে কিংবা বিনা শর্তে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানকেই ইসলামী পরিভাষায় 'তাফবীয' বলা হয়ে থাকে। এই 'তাফবীয'-এর ক্ষমতাবলে স্ত্রী নিজের উপর যে তালাক গ্রহণ করে থাকে, তাকে তালাকে তাফবীয বলা হয়। (বাদায়িউস সানায়ে ৪/২৪৭-২৪৮, ফাতাওয়া শামী ৩/৩১৫, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৮৮)

তাফবীয বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান সহীহ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন,

১. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে/বিনা শর্তে এ তালাক গ্রহণের ক্ষমতা মৌখিকভাবে/লিখিতভাবে অর্পণ করা। (ফাতাওয়া শামী ৩/৩১৪, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৮৪)

২. এ অধিকার প্রদান বিবাহের পর সংঘটিত হওয়া।

৩. অথবা (বিয়ের আগে এ অধিকার অর্পণ করতে চাইলে) তালাকের অধিকার গ্রহীতা কনেকে বিয়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে অর্পণ করা। যেমন এভাবে বলবে, 'যদি আমি এই মেয়েকে বিয়ে করি, তাহলে/ যখন আমি এই মেয়েকে বিয়ে করবো, তখন... শর্তসাপেক্ষে/ বিনাশর্তে

সে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে'। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৮৮, ফাতাওয়া শামী ৩/২৪২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৯/১০১)

৪. স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো, উক্ত তালাক স্বামীকে প্রদান না করে নিজের সত্তার উপর প্রয়োগ করা। যেমন, 'আমি আমার নফসের/সত্তার উপর এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করলাম' এভাবে বলা। (মাবসূতে সারাখসী ৩/২৬০, বাদায়িউস সানায়ে ৪/২৫৬, ফাতাওয়া শামী ৩/৩২৫-৩২৬, ফাতাওয়া উসমানী ২/৪০২)

আমাদের সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত কাবিননামার ১৮নং ধারাটি তালাকে তাফবীযের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কাবিননামায় উল্লিখিত তাফবীযের এই ১৮নং ধারা সম্পর্কে আমাদের সমাজে যেমন স্বামী-স্ত্রীর উদাসীনতা কিংবা অজ্ঞতা রয়েছে, তেমনি স্বামী কর্তৃক তাফবীয প্রদান অথবা স্ত্রী কর্তৃক তালাকে তাফবীয গ্রহণের ব্যাপারেও বেশকিছু ভুল-ভ্রান্তি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। যদ্দরুণ তালাকে তাফবীযের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। কাজেই বক্ষমান নিবন্ধে আমরা এই সামাজিক অজ্ঞতা এবং উদাসীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে তালাকে তাফবীযের কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো–

১. কাবিননামায় তাফবীয-এর ধারা সম্পর্কে বর-কনের উদাসীনতা : ধরণ ও প্রতিকার।

২. তাফবীয বা স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর ভুল-ভ্রান্তি এবং তাফবীয প্রদানের সঠিক পন্থা।

৩. তালাকে তাফবীয গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভুল-ভ্রান্তি।

৪. তাফবীয-এর শরঈ বিধান।

প্রথম বিষয়

কাবিননামায় তালাকে তাফবীযের ধারা সম্পর্কে বর-কনের উদাসীনতা প্রসঙ্গ

কাবিননামার ১৮নং ধারাটি তালাকে তাফবীযের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধারার খালি ঘরটি বর কর্তৃক পূরণীয় থাকে, যাতে লেখা থাকে-

'স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কি না? করিয়া থাকিলে কী কী শর্তে :......................

এ ধারা সম্পর্কে বর-কনে উভয় পক্ষেরই উদাসীনতা আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. বিবাহের মজলিসে উপস্থিত বর-কনে পক্ষ অনেক সময় অশিক্ষিত হওয়ার কারণে কিংবা দীনী মাসআলা-মাসাইল না জানার কারণে ১৮নং ধারার বিষয়বস্তু সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে এবং এমন অবস্থায়ই বর-কনে কাবিননামায় দস্তখত করে দেয় বা টিপসই দিয়ে দেয়।

২. অনেক সময় বর-কনে ১৮নং ধারার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তো জানে, কিন্তু অসতর্কতা কিংবা কাজি সাহেবের তাড়াহুড়ার কারণে ১৮নং ঘর খালি রেখেই তারা কাবিননামায় দস্তখত করে দেয়।

এ দু' সূরতে কাজি সাহেব সাধারণত নিজের পক্ষ হতে ১৮নং ধারায় নির্ধারিত কিছু গৎ লিখে দিয়ে থাকে, যেমন- *'হ্যাঁ, অর্পণ করিয়াছেন, বনিবনা না হলে, সামাজিক মর্যাদা না দিলে, ইত্যাদি...'*

৩. অনেক সময় বর ১৮নং ধারা সম্পর্কে তো জানে এবং সে উক্ত ধারার খালি ঘর নিজ হাতেই পূরণ করে, কিন্তু অজ্ঞতা কিংবা উদাসীনতার কারণে কনেপক্ষের উপস্থিতিতেই কাবিননামায় সে এবং তার স্ত্রী দস্তখত করে থাকে বিবাহের 'ঈজাব-কবুল' হওয়ার আগেই!

এ সকল উদাসীনতা দূরীকরণের স্বার্থে বর-কনে উভয় পক্ষের জন্য আবশ্যক হলো–

১. (আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, হালাল কামাই-রোজগার, নিজের দায়িত্বে অন্যের অধিকার এবং আত্মশুদ্ধি বিষয়ক ফরযে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা করার পাশাপাশি) বিবাহের পূর্বে বিবাহ সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা-মাসাইল কোনো বিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে জেনে নেয়া। অন্যথায় প্রয়োজনের মুহূর্তে সঙ্কট থেকে উত্তরণের পরিবর্তে আরো গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে!

২. শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে মৌখিকভাবে 'ঈজাব-কবুল' তথা বর-কনের একপক্ষ প্রস্তাব করা এবং অপর পক্ষের কবুল বলাই যথেষ্ট। কিন্তু সামাজিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে সরকারি কাবিননামার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কাজেই বর-কনের জন্য উচিত এই কাবিননামার সকল ধারা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এবং দাম্পত্য সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতির ক্ষেত্রে উত্তরণের পন্থা হিসেবে ১৮নং ধারা সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া এবং জেনে-বুঝে ১৮নং ধারাটি পূরণ করা।

৩. বর-কনে এ বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে, তাফবীযের বিষয়টি বিবাহের ঈজাব-কবুলের পর সংঘটিত করা, চাই মৌখিকভাবে হোক কিংবা লিখিতভাবে। আর যদি তাফবীযের বিষয়টি বিবাহের ঈজাব-কবুল হওয়ার আগে কাবিননামায় ১৮নং ধারা পূরণ করত দস্তখত করার মাধ্যমে হয়, তবে যেন কাবিননামার দস্তখত অবশ্যই বিবাহের ঈজাব-কবুলের পর করা হয়। অন্যথায় ১৮নং ধারায় উল্লিখিত তাফবীযের বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং স্ত্রীও প্রয়োজনের মুহূর্তে উক্ত ধারার অধিকার বলে নিজের উপর কোনো তালাক গ্রহণ করতে পারবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৮৮, ফাতাওয়া শামী ৩/৩২৬, বেহেশতী যেওর ৪/২৯৩ দারুল ইশাআত)

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি মাসআলা

১. স্বামী যদি কাবিননামার ১৮নং ধারা না জেনে কিংবা পূরণ না করেই কাবিননামায় দস্তখত করে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে কাজি সাহেব ১৮নং ধারার খালি ঘরে নিজের পক্ষ থেকে 'স্ত্রীকে শর্তসাপেক্ষে/বিনাশর্তে তালাকের অধিকার প্রদান করা হলো' লিখে দেয়, তবে কি এ তাফবীয শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে?

২. বর যদি ১৮নং ধারায় স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান করে, কিন্তু কাবিনামায় দস্তখত করে বিবাহের ঈজাব-কবুলের আগেই, তবে কি এ তাফবীয শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে? এক্ষেত্রে 'বিবাহের মজলিস' কি 'বিবাহের দিকে সম্বন্ধ' হিসেবে ধর্তব্য হবে?

৩. বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরে দস্তখতের দুই সূরতে যখন হুকুমগত পার্থক্য হবে, তখন পরবর্তীতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজনের মুহূর্তে 'দস্তখত কখন দিয়েছে, তা মনে না থাকলে' কোন্ সূরত ধরে নেয়া হবে?

প্রথম মাসআলা

এ মাসআলার জবাবের পূর্বে তিনটি বিষয় জ্ঞাতব্য-

১. প্রথম বিষয় হলো, কাবিননামা পূরণের মূল দায়িত্বশীল হলো স্বামী এবং স্ত্রীপক্ষ। কেননা, ফরম পূরণ বা কাবিননামায় স্বাক্ষর করার সাথে বিবাহের শরঈ কোন আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে এ দম্পতি কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যেন সরকারি প্রশাসনের সাহায্য পাওয়া যায়, এ জন্যই কাবিননামা পূরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং স্বার্থটা স্বামী-স্ত্রীর। এ কারণেই

নিকাহনামার সমস্ত ধারা স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই এবং তাদের স্বাক্ষর ছাড়া এই ফরমের কোন মূল্য নেই।

২. দ্বিতীয় বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে 'ওকীল' বা প্রতিনিধি বলা হয়ে থাকে- و هو إقامة الغير مقام نفسه ترفها او عجزا *'সহজের জন্য বা অক্ষমতার কারণে অন্যকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা'*। (ফাতাওয়া শামী ৫/৫১০)

৩. তৃতীয় বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে খালি কাগজের নিচে দস্তখত করে কারো নিকটে তা অর্পণ করার অর্থ হলো, *'ঐ কাগজে গ্রহীতা যা লিখবেন, তার সাথে দস্তখতকারী একমত'*।

এর একটি দৃষ্টান্ত : হযরত মু'আবিয়া রাযি. এবং হযরত হাসান রাযি. এর মাঝে সন্ধির ঘটনা। হযরত মু'আবিয়া রাযি. একটি সাদা কাগজের নিচে নিজের মোহর অঙ্কিত করে এ মর্মে হযরত হাসান রাযি.-এর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, 'এ কাগজের মধ্যে আপনি যা ইচ্ছা শর্ত করতে পারেন, তা গৃহিত হবে'। (আল-কামেল ফিত-তারীখ ৩/২৭২)

মূল প্রশ্নের জবাব

যখন স্বামী-স্ত্রী পক্ষ তাদের এ কাবিননামা পূরণের দায়িত্ব কাজি সাহেবের উপর ন্যস্ত করছেন, তখন কাজি সাহেবের এই নিকাহনামা পূরণ করে দেয়াটা দু'-কারণে হতে পারে। (১) স্বামী-স্ত্রী কেউ তা পড়ার বা বুঝার যোগ্যতা রাখে না। (২) স্বামী-স্ত্রী এই বিষয়ে কোন আগ্রহ রাখে না; তারা শুধু চায়, বিয়েটা কোনমতে হয়ে গেলেই হল! প্রথম কারণে হলে স্বামী-স্ত্রীর জাহালাত বা অক্ষরজ্ঞানশূন্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কারণে হলে বিবাহ সম্পাদনা বিষয়ে তাদের অসচেতনতা প্রমাণিত হচ্ছে। সর্বোপরি উভয় অবস্থায় কাবিননামার ১৮নং ধারা খালি রেখে দস্তখত করত কাযী সাহেবের নিকট তাদের নির্বাক-সমর্পণ প্রমাণ করছে, তারা এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক দায়-দায়িত্ব কাজি সাহেবের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং কাজি সাহেব ১৮নং ধারায় যা লিখবেন, তার সাথে তারা একমত।

কাজেই পরবর্তীতে কাজি সাহেব ১৮নং ধারায় যা লিখবেন, তা মূলত 'বরের' পক্ষ থেকে وكيل বা প্রতিনিধি হয়েই লিখবেন। আর এ কথা স্বীকৃত যে, বিবাহ এবং তালাকের মধ্যে প্রতিনিধির কার্যাবলী 'মক্কেল' তথা প্রতিনিধি নিযুক্তকারীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। (ফাতহুল কাদীর ৩/১৯৮) কাজেই কাজির পূরণ করা এটা মূলত স্বামী-স্ত্রীর নিজেরা পূরণ করার নামান্তর। কাজেই ১৮নং ধারায় কাজি সাহেব যদি স্বামীর পক্ষ থেকে 'তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন' মর্মে লিখে দেয়, তবে তাতে তাফবীয সহীহ হয়ে যাবে এবং এ তাফবীযের ভিত্তিতে স্ত্রী পরবর্তীতে তালাক গ্রহণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় মাসআলা

বিবাহের ঈজাব-কবুলের আগে কাবিননামায় দস্তখত করলে উক্ত দস্তখতের ভিত্তিতে ১৮নং ধারায় উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে তাফবীয বৈধ হবে না এবং এর ভিত্তিতে স্ত্রী নিজের নফসের উপর কোনো তালাকও গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, তাফবীয গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এ অধিকার প্রদান বিবাহের (ঈজাব-কবুলের) পর সংঘটিত হওয়া অথবা (বিয়ের আগে এ অধিকার অর্পণ করতে চাইলে) তালাকের অধিকার গ্রহীতা কনেকে বিয়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে অর্পণ করা। যেমন এভাবে বলবে, 'বিবাহের পর' বা 'যখন বিবাহ করবো' তখন এই এই... শর্তসাপেক্ষে/বিনাশর্তে সে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। বিয়ের পর কিংবা বিয়ের দিকে সুস্পষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত করে তালাকের অধিকার অর্পণ করা ব্যতীত তাফবীয বা তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান বৈধ হবে না।

এক্ষেত্রে বিবাহের মজলিস রূপক অর্থে বিয়ের দিকে সম্বন্ধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তাফবীযের আলোচনা সাধারণত বিবাহের মজলিসেই হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে 'বিবাহের মজলিস' যদি রূপক অর্থে 'বিবাহের দিকে সম্বন্ধ' হিসেবে ধর্তব্যই হতো, তবে ফুকাহায়ে কেরাম তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। অথচ ফুকাহায়ে কেরাম 'বিবাহের মজলিস'কে 'বিবাহের দিকে সম্বন্ধ' হিসেবে উল্লেখ করেননি। কাজেই বিবাহের মজলিস রূপক অর্থে বিয়ের দিকে সম্বন্ধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, কাবিননামার মধ্যেই যদি 'বিবাহের পর' বা 'যখন বিবাহ করবো' এ জাতীয় সংযোজন হতো তাহলেই কেবল বিবাহ পরবর্তী সময় যেমন কাবিননামায় দস্তখতের দ্বারা বিনাবাক্যে তাফবীয হয়ে যায়, এখানেও শুধু দস্তখতের দ্বারা সেই তাফবীয হয়ে যেত।

১. ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৪২০-
ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك.

২. ফাতাওয়া শামী ৩/৩৪৪-
وشرطه الملك أو الإضافة إليه بأن يكون معلقا بالملك أو بسبب الملك كالنكاح: أي التزوج.

৩. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৯/১০১-
মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ. লেখেন,

اگر قبل عقد ان شرائط سے تفویض طلاق کی ہے اور انکو نکاح کیطرف منسوب ومضاف نہیں کیا ہے تو شرعاً اسکا کوئی اعتبار نہیں یہ سب شرطیں اور تفویض بیکار ہیں۔ (فتاوی محمودیہ ۱۹/۱۰۱ تفویض طلاق)

তৃতীয় মাসআলা

বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের পরে দস্তখতের দুই সূরতে যখন হুকুমগত পার্থক্য হবে, তখন পরবর্তীতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজনের মুহূর্তে 'দস্তখত কখন দিয়েছে, তা মনে না থাকলে' কোন্ সূরত ধরে নেয়া হবে? এর জবাব হলো, কাজি সাহেবদের 'সাধারণ প্রচলন' হলো, তারা বিবাহের ঈজাব-কবুলের পর সাইন নিয়ে থাকে, আগে নয়। কোথাও আকদের আগে সাইন করার ঘটনা ঘটে থাকলে সেটা বর-কনেপক্ষের আবদারেই হয়; সাধারণ অবস্থায় নয়। কাজেই 'দস্তখত বিবাহের আগে দিয়েছে, না কি পরে' মনে না থাকলে সাধারণ প্রচলনই ধরে নেয়া হবে এবং 'তাফবীযের ভিত্তিতে স্ত্রী তালাক গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হবে'।

দ্বিতীয় বিষয়

তাফবীয বা স্ত্রীকে নিজের নফসের তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর ভুল-ভ্রান্তি

ভ্রান্তি এক. কাবিননামায় ১৮নং ধারায় স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের সমাজে নির্ধারিত কিছু গৎ লিখে দেয়া হয়। পূর্বাপর চিন্তা না করে কিংবা অদূরদর্শিতার কারণে নির্ধারিত এ জাতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয়ে থাকে, তা হলো–

এমন কিছু অস্পষ্ট শর্ত দেয়া হয়, পরবর্তীতে বৈবাহিক সঙ্কটের ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। স্ত্রীপক্ষ বিচ্ছেদের স্বার্থে শর্তের উপস্থিতির দাবী করে, পক্ষান্তরে স্বামীপক্ষ তা অস্বীকার করে। এ জাতীয় অস্পষ্ট শর্তের মধ্যে রয়েছে *'বনিবনা না হলে, সামাজিক মর্যাদা না দিলে...'* ইত্যাদি।

বৈবাহিক জীবনে অতি তুচ্ছ বিষয়েও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ হতে পারে।

এখন শয়তানের প্ররোচনায় স্বার্থান্বেষী কোনো এক পক্ষ 'বনিবনা না হলে, সামাজিক মর্যাদা না দিলে' এ অস্পষ্ট শর্তের সুযোগে স্ত্রীকে দিয়ে তালাক গ্রহণ করাতে বাধ্য করতে পারে।

এর বিপরীতে কোনো কোনো কাবিননামায় যে স্পষ্ট আকারে শর্তের উল্লেখ করা হয় না, বিষয়টি এমন নয়; কিন্তু তাতে একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর তা হলো, হয়তো অনেক শর্তের একটি দীর্ঘ তালিকা লিখতে হবে, অথবা সংক্ষেপণ করতে গিয়ে এমন কিছু শর্ত বাদ দিতে হবে, যার কারণেও ভবিষ্যতে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে! যেমন- লেখা হলো, '*ভদ্রোচিত খোরপোষ না দিলে, যৌতুক দাবী করিলে, ইত্যাদি।' এ শর্তগুলো তো স্পষ্ট*, কিন্তু এখানে যৌক্তিক আরো অনেক শর্তই রয়েছে, যার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন ছিলো।

ভ্রান্তি দুই. তিন তালাকের তাফবীয করা। অথচ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এক তালাকে বায়েনই যথেষ্ট ছিলো। তিন তালাকের কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

তিন তালাকের পর একটি প্রধান সমস্যা এই হয় যে, বিচ্ছেদের পর যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নতুন করে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তারা দু'জনে নতুন করে ঘর-সংসার করতে চায়, তখন তিন তালাকের কারণে তা আর সম্ভব হয় না। কাজেই তিন তালাক নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

এ দু'-ভ্রান্তি নিরসনে স্বামীর জন্য করণীয় হলো,

সংক্ষিপ্ত, ব্যাপক অর্থবোধক ও স্পষ্ট কোনো শর্ত উল্লেখ করে এক তালাকে বায়েনের তাফবীয প্রদান করা। যেমন- এভাবে বলা যেতে পারে যে, '*উভয় পক্ষের দু'জন করে মোট চারজন অভিভাবকের যৌথ সিদ্ধান্তক্রমে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা সম্ভব না হয়, তবে সিদ্ধান্ত পরবর্তী এক মাসের (উদাহরণত) মধ্যে যখন ইচ্ছা স্ত্রী তার নিজের নফসের উপর এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করতে পারবে'।*

অথবা এভাবে বলা যে, '*একজন হক্কানী বিজ্ঞ মুফতী সাহেবের সিদ্ধান্তক্রমে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা সম্ভব না হয়, তবে সিদ্ধান্ত পরবর্তী এক মাসের (উদাহরণত) মধ্যে যখন ইচ্ছা স্ত্রী তার নিজের নফসের উপর এক তালাকে বায়েন গ্রহণ করতে পারবে'।*

প্রাসঙ্গিক মাসআলা

১. যদি তালাকে বায়েন বা তালাকে রজঈ-এর বিবরণ ছাড়া কেবল 'তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছি' লিখে দেয়, তবে কোন তালাক পতিত হবে? রজঈ নাকি বায়েন?

২. যদি তাফবীয করার ক্ষেত্রে তাফবীযে তালাকের অধিকার 'যখন ইচ্ছা' প্রয়োগ করবে, কিংবা যে মুহূর্তে শর্তের খেলাফ করবে, সে মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারবে, এমন কোনো কথার উল্লেখ ১৮নং ধারায় না থাকে, তবে এ অধিকার কি অবগতির মজলিসের সাথেই প্রযোজ্য হবে? নাকি অবগতির মজলিসের পরও স্ত্রী যখন ইচ্ছা তালাক গ্রহণ করতে পারবে?

প্রথম মাসআলা

এখানে মূলত দু'টি বিষয় লক্ষণীয়–

এক. স্বামী যে শব্দে তাফবীয করেছে, তা কি 'সরীহ' (তালাকের সুস্পষ্ট শব্দ) না কি কেনায়াহ (সুস্পষ্ট তালাকের শব্দ নয়; বরং তালাকের ইঙ্গিতবহ বাক্য) কেননা, দুই ধরনের শব্দের মাঝে হুকুমগত পার্থক্য রয়েছে। প্রথম শব্দের কারণে তালাকে রজঈ'র তাফবীয হবে, আর দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা তালাকে বায়েনের তাফবীয হবে

দুই. স্ত্রী যে শব্দে তাফবীয তালাক গ্রহণ করেছে, তা কি সরীহ নাকি কেনায়াহ?

প্রথম বিষয় : এক্ষেত্রে কাবিননামার ১৮নং ধারাটি লক্ষণীয়-

'*স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন কি না? করিয়া থাকিলে কী কী শর্তে?'* –এ ধারায় স্বামী (কিংবা স্বামীর পক্ষ হতে 'ওকীল' হিসেবে কাজি সাহেব) যখন 'হ্যাঁ' লিখবে, চাই তা শর্তসাপেক্ষে লেখা হোক, কিংবা বিনাশর্তে লেখা হোক, তখন তার দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হবে। (আল-বাহরুর রায়িক ৩/৫৩৮, ফাতাওয়া শামী ৩/৩২২-৩২৩)[১]

দ্বিতীয় বিষয় : স্ত্রীর শব্দ প্রসঙ্গ

তাফবীযের ভিত্তিতে স্ত্রী কর্তৃক ডিভোর্স লেটারে সাধারণত থাকে, 'আমি আমার নিজ নফসের উপর তালাক গ্রহণ করিলাম।' এক্ষেত্রে স্ত্রীর শব্দ 'সরীহ' শব্দ। আর সরীহ শব্দ দ্বারা যদিও তালাকে রজঈ পতিত হয়, কিন্তু যখন তা স্বামী কর্তৃক বায়েন তালাক তাফবীয করার বিপরীতে আসবে, তখন স্বামীর তাফবীযকৃত বায়েন তালাকই গৃহীত হবে; স্ত্রীর বাক্য ধর্তব্য হবে না। (অনুরূপভাবে যখন স্বামী তালাকে রজঈ'র তাফবীয করবে, কিন্তু স্ত্রীর নিজের উপর তালাকে বায়েন গ্রহণ করবে, তখনও স্বামীর তাফবীযকৃত রজঈ পতিত হবে, স্ত্রীর বাক্যটি বায়েনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।) কাজেই আমাদের সমাজে কাবিননামার ভিত্তিতে তাফবীযের বর্তমান চলমান পদ্ধতিতে তালাকে বায়েন পতিত হবে; রজঈ নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা

ফিকহে হানাফীর কিতাবাদিতে সাধারণভাবে এ মাসআলা উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, যদি তাফবীয করার ক্ষেত্রে তা কোনো শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয় এবং 'যখন ইচ্ছা' প্রয়োগ করবে, কিংবা 'যে মুহূর্তে শর্তের খেলাফ করবে, সে মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারবে', এমন কোনো বিশেষণের উল্লেখ না থাকে, তবে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের অধিকার অবগতির মজলিসের সাথে খাস

১.

قال العلامة ابن نجيم فى البحر الرائق : ٥٣٨/٣) : (قوله: أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية) لأنه جعل لها الاختيار بتطليقة وهي معقبة للرجعة، والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه نحو أنت طالق بائن يصير بائنا قيد بقوله في تطليقة لأنه لو جعل أمرها بيدها لو لم تصل نفقتي إليك تطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت قال: يكون بائنا وهكذا أجاب القاضي بديع الدين لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر بخلاف ما لو قال: أمرك بيدك بتطليقة واحدة تطلقي نفسك متى شئت حيث تكون رجعية كما في أمرك بيدك في تطليقة كذا في الصيرفية، وفي جامع الفصولين أمرك بيدك تطلقي نفسك غدا فلها أن تطلق نفسها للحال وقوله: تطلقي إلى آخره مشورة اهـ.وفي أمرك بيدك لكي تطلقي نفسك أو لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي نفسك فطلقت فهي واحدة بائنة. اهـ.

وقال ايضا (٣/٥٤٧–٥٤٨): (قوله: ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة) يعني في جواب قوله اختاري وإنما صلح جوابا له لأن التطليق داخل في ضمن التخيير فقدأتت ببعض ما فوض إليها كما لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة بخلاف ما لو قالت اخترت نفسي في جواب طلقي نفسك لأن الاختيار لم يفوض إليها لا قصدا ولا ضمنا وإنما وقع به البائن دون الرجعي، وإن كان صريحا لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج

থাকবে। অর্থাৎ স্ত্রী যখন জানতে পারবে যে, তাফবীযের শর্ত পাওয়া যাওয়ায় তার এখন তালাক গ্রহণের অধিকার লাভ হয়েছে, তখনই (চাইলে) তালাক গ্রহণ করতে পারবে। অবগতির এই মজলিস থেকে উঠে গেলে কিংবা ভিন্ন কোনো কাজে লিপ্ত হলে, তার এ অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ৩/৩১৬)

قال العلامة ابن نجيم فى البحر الرائق : ٣/٥٣٩-٥٤٠, ٥٤٣) : قوله : (ولو قال لها اختارى ينوى الطلاق فاختارت فى مجلسها بانت بواحدة ولم تصح نية الثلاث فان قامت أوأخذت فى عمل أخر بطل خيارها) : وأراد بنية الطلاق نية تفويضه... (الى ان قال) : وبخطابها إلى أنه لو خيرها وهي غائبة اعتبر مجلس علمها، ولو قال : جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا اليوم فلو مضى اليوم ثم علمت خرج الأمر من يدها وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها،... (إلى ان قال) : وقيد بكون التخيير مطلقا لأنه لو كان موقتا كما إذا قال : اختاري نفسك اليوم أوهذا الشهر أوشهرا أوسنة فلها أن تختار ما دام الوقت باقيا سواء أعرضت عن ذلك المجلس أو لا كذا في الجوهرة.

কিন্তু লক্ষণীয় হলো, ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত মজলিসের সাথে খাস হওয়ার বিষয়টি কোনো 'মানসূসী মাসআলা' (কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত মাসআলা) নয়; বরং তা একটি 'ইজতিহাদী মাসআলা' (ফুকাহায়ে কেরামের উদ্ভাবিত মাসআলা)। কাজেই এ জাতীয় মাসআলার মধ্যে 'উরফে আম' বা 'সামাজিক ব্যাপক প্রচলনের' ভিত্তিতে মাসআলার পরিবর্তন হতে কোনো সমস্যা নেই। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, 'আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম' বাক্যটি ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা মতে 'কেনায়াহ' (সুস্পষ্ট তালাকের শব্দ নয়; বরং তালাকের ইঙ্গিতবহ বাক্য), যদ্দরুণ এর দ্বারা তালাকের নিয়ত থাকার শর্তে 'বায়েন তালাক' পতিত হওয়ার বিষয়টি ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভবে প্রমাণিত। কিন্তু বর্তমানে উল্লিখিত বাক্যটি 'তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাওয়ায় 'সরীহ' (সুস্পষ্ট তালাকের শব্দ) হয়ে গেছে। যদ্দরুন বর্তমানে এ বাক্যটির দ্বারা তালাকের নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হবে এবং তার দ্বারা তালাকে রজঈ হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৫/১৬৬)

আলোচিত মাসআলাটিও তদ্রূপ। ১৮নং ধারার মাধ্যমে তাফবীয প্রদান করার পর যখন সে ধারায় 'যখন ইচ্ছা' প্রয়োগ করবে, কিংবা 'যে মুহূর্তে শর্তের খেলাফ করবে, সে মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারবে', এমন কোনো বিশেষণের উল্লেখ না থাকে- তখন আমাদের 'উরফে আম' বা সমাজের ব্যাপক প্রচলন হলো যে, এ ধরনের তাফবীযকে 'স্ত্রী যখন ইচ্ছা, নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে' মর্মে ধরে নেয়া হয়। কাজেই সামাজিক এ ব্যাপক প্রচলন হিসেবে বর্তমানে ১৮নং ধারার ভিত্তিতে তাফবীয প্রদান করলে এ অধিকার স্ত্রীর অবগতির মজলিসের সাথে খাস হবে না; বরং অধিকার প্রাপ্তির পর স্ত্রী যখন ইচ্ছা নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে।

١-قال ابن عابدين فى "حاشيته : .٤/٤٣٤)فى اعتبار العرف : أن التحقيق أن لفظه والموصي، والحالف، والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا. اهـ

٢-وفى اسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية : صـــ٢٠٧)العرف القولى : هو ان يشيع بين الناس استعمال بعض الالفاظ او التراكيب فى معنى معين بحيث يصبح ذالك المعنى هو المفهوم المتبادر منها الى أذهانهم عند الاطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقلية.انتهى كذالك فى "درر الحكام شرح مجلة الاحكام: ٤٦/١)

٣- وفى اسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية :صـــ٢١١)

العرف الصحيح : ما تعارفه الناس شرط ألا يخالف نصا شرعيا ولا إجماعا ولا يفوب مصلحة أو يجلب مفسدة . كذالك فى "درر الحكام شرح مجلة الاحكام: ٤٦/١)

٤- وفى اسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية :صـــ٢١٣)— فى شرائط إعتبار العرف : ان يكون العرف عاما و ان لا يخالف العرف نصا شرعيا صـــ ٢١٣)

وقال ابن عابدين فى شرح عقود رسم المفتى (صت١٨٠مكتبة زكريا, ديوبند): فى تغير الاحكام بتغير العرف : وفى القنية : ليس للمفتى ولا للقاضى ان يحكم على ظاهر المذهب ويتركا العرف اهـــ ونقله منها فى "خزانة الروايات"ز وهذا صريح فيما قلنا : من ان المفتى لا يفتى بخلاف عرف اهل زمانه.

তৃতীয় বিষয়

তালাকে তাফবীয গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভুল-ভ্রান্তি

তালাকে তাফবীয গ্রহণের ক্ষেত্রে স্ত্রীও অনেক সময় ভুল করে থাকে। যেমন-

১. শর্তের বাস্তব উপস্থিতি ছাড়াই তাফবীয তালাক গ্রহণ করা : অনেক সময় কাবিননামায় ১৮নং ধারায় উল্লিখিত শর্তের যথাযথ উপস্থিতি ছাড়াই স্ত্রী স্বেচ্ছায় কিংবা পারিবারিক চাপের কারণে ডিভোর্স নিয়ে নেয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে শর্তের বাস্তব উপস্থিতি ছাড়া স্ত্রী তালাক গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হয় না। কাজেই সেক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের উপর তালাক গ্রহণ করলেও তালাক পতিত হবে না। (মাজমাউল আনহুর ১/৫৪৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১০৬/৩০৭, উমদাতুর রিআয়াহ ৩/১৯৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১০/৩৮)

২. কখনো কখনো স্ত্রী অজ্ঞতাবশত কিংবা অদালতের অনুসরণে নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণের পরিবর্তে স্বামীকে ডিভোর্স দেয়! অথচ তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্র হলো স্ত্রী; স্বামী নয়। কাজেই কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে তালাক দেয়, তবে সে তালাক পতিত হবে না। (বাদায়িউস সানায়ে ৩/১১৩, ১১৬, তাবয়িনুল হাকায়িক ৩/৯৪, ফাতাওয়া শামী ৩/১৯০, (ফাতাওয়া কাসিমিয়্যাহ ১৪/৯৪)

৩. দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানোমালিন্য হতেই পারে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় স্ত্রীও বিচ্ছেদ চায় না। কিন্তু অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের চাপে পড়ে সে বাধ্য হয় তালাকে তাফবীয গ্রহণ করে ডিভোর্স লেটার পাঠাতে। এ কাজটিও উচিত নয়; বরং মনোমালিন্য হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই করণীয় হলো, প্রথমত একজন অন্যজনকে ছাড় দিয়ে নিজেদের মাঝে বিষয়টির সমঝোতা করে নেয়া। এটা সম্ভব না হলে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ মুরব্বীদের তত্ত্বাবধানে বিষয়টির মীমাংসা করে নেয়া। কাজেই এ বিষয়ে স্ত্রীর অবশ্যই সচেতন হতে হবে। (সূরা নিসা-৩৪, ৩৫, ১২৮)

৪. অনেক সময় কনেপক্ষের অতি উৎসাহী কাণ্ডজ্ঞানহীন কিংবা স্বার্থান্বেষী লোকেরা স্ত্রীকে বুঝিয়ে তার থেকে 'সাদা কাগজে' দস্তখত/টিপসই নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে উক্ত কাগজকে 'ডিভোর্স লেটার' হিসেবে উপস্থাপন করে। কাজেই স্ত্রীর অবশ্যই এ ধরনের কার্যক্রমের ব্যাপারে সতর্ক অবস্থান জরুরী।

৫. অনেক সময় স্বামী জেনে বা না জেনে স্ত্রীকে তিন তালাকের তাফবীয করে থাকে, যা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কাজ। আবার স্ত্রীও অনেক সময় অজ্ঞতা কিংবা রাগবশত তিন তালাক নিজের নফসের উপর গ্রহণ করে থাকে। এ কাজটিও বিচক্ষণতার পরিপন্থি। কেননা এক তালাকে বায়েন দ্বারাই দাম্পত্য জীবনের

বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় তিন তালাক গ্রহণ অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া তিন তালাক দিলে পরবর্তীতে অনুশোচনা হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীকে 'হালালা'[১] ছাড়া ফিরিয়ে নেয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না। এর বিপরীতে এক তালাকে বায়েন দ্বারা বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও পরবর্তীতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে হালালা ছাড়াই ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে।

প্রাসঙ্গিক মাসআলা

১. বর্তমানের عرف (প্রচলন) হিসেবে, তাফবীয-এর ক্ষমতাবলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদান প্রকারান্তরে নিজের উপরই তালাক গ্রহণ বলে গণ্য হতে পারে কি না?

এর মৌলিক জবাব হলো, এ ধরনের উরফ বা প্রচলন গ্রহণযোগ্য নয়। আর তা দুই কারণে–

প্রথমত : উরফ বা প্রচলন বলা হয়,

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول بشرط أن لا يخلف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشرع

অর্থ : যে বিষয় লোকদের মাঝে জ্ঞানগতভাবে (প্রবৃত্তির চাহিদা বা সাময়িক কোনো কারণে নয়) স্থায়িত্ব লাভ করে এবং সুস্থ রুচিশীল লোকদের নিকট যা গৃহীত হয়। তবে শর্ত হলো, তা কোনো 'শরঈ নস' (কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা) কিংবা শরীয়তের কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হতে হবে। (আসবাবু উদূলিল হানাফিয়্যাহ আনিল ফুতইয়া বি-জাহিরির্ রিওয়ায়াহ; পৃষ্ঠা ১৯৩)

আজকাল কোর্ট-কাচারি ও সরকারি প্রশাসন বিভাগের ধর্মহীনতা ও শরীয়ত সম্পর্কে উদাসীনতা যখন ব্যাপকতা ধারণ করেছে তখন তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধের উপর নির্ভর করে এই প্রচলনকে 'গ্রহণযোগ্য প্রচলন' হিসেবে কিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? তাছাড়া 'তালাকনামার নোটিশ' দ্বারা উক্ত কথার প্রচলনের দাবী করা যায় না। কারণ সে নোটিশে 'স্বামীকে তালাক প্রদান' বলে কোন শব্দের উল্লেখ নেই। সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে, '... নিজ নফসের প্রতি তালাক প্রদান/গ্রহণ করিলাম'। সুতরাং স্ত্রীর বাক্য 'আমি আমার স্বামীকে তালাক প্রদান করিলাম' বাক্যটি 'আমি আমার নফসের উপর তালাক প্রদান করিলাম' বাক্যের ক্ষেত্রে কখনোই প্রচলন হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : প্রচলন বা উরফের কারণে কোনো বিষয়ের 'হাকীকত' বা মৌলিকত্ব তখনই পরিত্যাগ করা হয় যখন মৌলিকত্বের ব্যবহার আর বাকী থাকে না। (দ্র.আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. 'নাশরুল উরফ ফী বিনাই বা'যিল আহকামি আলাল উরফ'; রিসালায়ে ইবনে আবিদীন ২/১১৪)

সুতরাং প্রশ্ন হলো, তাফবীযের ভিত্তিতে 'আমি স্বামীকে তালাক দিচ্ছি' বাক্যটি কি তালাক গ্রহণকারিণী সকল স্ত্রীই 'আমি আমার নফসের উপর তালাক প্রদান করছি'–এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে? কখনোই নয়; বরং কেউ কেউ এটাও মনে করে থাকে যে, 'আমারও স্বামীর উপর তালাক প্রয়োগের ক্ষমতা হয়ে গেছে, কাজেই তাকে আমি তালাক দিচ্ছি'। সুতরাং সংশ্লিষ্ট মাসআলায় 'প্রচলন' গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. স্ত্রীর কাছ থেকে যদি সাদা কাগজে দস্তখত নেয়া হয় এবং পরে তা ডিভোর্স লেটারে পরিণত করা হয়, তবে এক্ষেত্রে তাফবীযে তালাক কার্যকর হবে কি না?

এখানে দু'টি সূরত হতে পারে–

এক. তার থেকে জোরপূর্বক দস্তখত নেয়া। জোরপূর্বক-এর অর্থ হলো, তার জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকা।

দুই. জোরপূর্বক দস্তখত নেয়া হয়নি; বরং তার ইচ্ছায় অর্থাৎ তার জান-মালের কোনো আশঙ্কা না থাকা অবস্থায় তার থেকে দস্তখত নেয়া হয়েছে।

প্রথম সূরতে এই ডিভোর্স লেটার গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি স্ত্রী মৌখিকভাবে নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণ না করে থাকে। (ফাতাওয়া শামী ৩/২৩৬, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ৪/৪২৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যাহ ১৫/১৮৩)

আর দ্বিতীয় সূরতে ডিভোর্স লেটার কার্যকর হবে। (হযরত মু'আবিয়া রাযি. এবং হযরত হাসান রাযি. এর ঘটনা এর দলীল, যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এছাড়াও দেখা যেতে পারে ফাতাওয়া শামী ৩/২৪৬-২৪৭, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যাহ ১৫/১৮৫)

চতুর্থ বিষয়

তাফবীযে তালাকের শরঈ বিধান

১. আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদি শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অধিকার দেয়া হয় এবং কত তালাকের অধিকার প্রদান করা হয়েছে, তার কোনো সংখ্যা উল্লেখ না থাকে, তবে তার দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর স্বামী কর্তৃক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সংখ্যা উল্লেখ থাকলে যেমন 'দুই তালাক, তিন তালাক-এর অধিকার প্রদান করিলাম', তবে স্ত্রী স্বামীর উল্লিখিত সংখ্যা কিংবা তার চেয়ে কম সংখ্যক তালাক নিজের নফসের উপর গ্রহণ করতে পারবে। যেমন, স্বামী তাকে তিন তালাকের অধিকার প্রদান করলে সে তার নিজ নফসের উপর এক তালাক বা দুই তালাকও নিতে পারবে।

وقال العلامة ابن نجيم فى البحر الرائق (٣/٥٤٧-٥٤٨): قوله: وان قال لها : اختارى اختارى اختارى فقالت : اخترت الأولى أوالوسطى أوالأخيرة وقع الثلاث بلا نية ولو قالت طلقت نفسي أواخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة يعني في جواب قوله اختاري وإنما صلح جوابا له لأن التطليق داخل في ضمن التخيير فقدأتت ببعض ما فوض إليها كما لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة بخلاف ما لو قالت اخترت نفسي في جواب طلقي نفسك لأن الاختيار لم يفوض إليها لا قصدا ولا ضمنا وإنما وقع به البائن دون الرجعي، وإن كان صريحا لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج

২. তালাক বায়েন পতিত হওয়ার পর স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রীর ইদ্দত তথা তিন হায়েয অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত খোরপোষ দেয়া আবশ্যক। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৫/৩৯৯, ফাতাওয়া শামী ৩৪১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১১/৩৪৯)

৩. যদি তিন তালাকের অধিকার প্রদান না করে থাকে অথবা স্ত্রী তিন তালাক গ্রহণ না করে থাকে, তবে উক্ত স্বামীর জন্য নতুন মোহরানা ধার্য করত পুনরায় ঘর-সংসার করা বৈধ হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৭২)

সারসংক্ষেপ

➢ বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যুগে কোনো নারী যেন বিবাহিত জীবনে দ্বি-মুখী সঙ্কটের শিকার না হয়, এ জন্য পূর্বসতর্কতা হিসেবে বিবাহের সময় তাফবীযের শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যেতে পারে।

(৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

---

১. হালালা অর্থাৎ তিন তালাকের ইদ্দত শেষে মোহর ধার্য করত দুজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক উক্ত মহিলাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেওয়া বা মৃত্যুবরণ করা। অতঃপর তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত পালন শেষে নিয়মানুযায়ী প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ করা। এই হালালার পর প্রথম স্বামী উক্ত স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করতে পারবে।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

ডাক্তার টিটু
সেক্টর- ৩, উত্তরা, ঢাকা

২৭৩ প্রশ্ন : (ক) ঘরে বসে আমল করে মৃত ব্যক্তির রূহে সওয়াব পাঠানো আর সশরীরে কবরস্থানে হাযির হয়ে যিয়ারত করা– এ দু'-টোর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? অর্থাৎ সশরীরে কবরস্থানে উপস্থিতির বিশেষ কোন ফায়দা আছে? অনেকে বলে, যারা যিয়ারত করতে আসে কবরবাসী কবরে শুয়ে শুয়ে তাদেরকে দেখতে পান ও চিনতে পারেন– এ কথা কতটুকু সঠিক?

(খ) স্ত্রীর ইন্তিকাল হলে স্বামী তাকে গোসল করাতে বা কবরে নামাতে পারবে কি না? নাকি ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে পর্দার বিধান চালু হয়ে যাবে?

(গ) দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে জানানো বা তার সন্তুষ্টির প্রয়োজন আছে কি না? যদি কেউ প্রথম স্ত্রীকে না জানিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করে থাকে, তাহলে এখন তার কী করণীয়? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) ঘরে বসে ঈসালে সওয়াব করা আর সশরীরে কবরস্থানে হাযির হয়ে যিয়ারত করে ঈসালে সওয়াব করার মধ্যে সওয়াব পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ উভয় অবস্থায় তার রূহে উক্ত আমলের সওয়াব পৌঁছে থাকে। তবে সশরীরে যিয়ারতের ভিন্ন ফযীলত রয়েছে। কবরের কাছে গিয়ে সালাম দিলে কবরস্থ ব্যক্তি তার সালাম শুনতে পায় এবং সে উক্ত যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে। এর দ্বারা তার আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়। অপরদিকে যিয়ারতকারীও নিজ মৃত্যুকে স্মরণ করে পরকালের প্রস্তুতি নেয়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং তার মনে পরকালের চিন্তা জাগ্রত হয়, যেটা ঘরে বসে ঈসালে সওয়াবের ক্ষেত্রে হাসিল হয় না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৩৮, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৮৮৫৭, ফাতাওয়া শামী ২/২৪২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৩৬৩, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১০/১৭২)

(খ) স্ত্রীর ইন্তিকালের পর স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবে না। স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না এবং কবরেও নামাতে পারবে না। কারণ স্ত্রীর ইন্তিকালের কারণে উভয়ের মাঝে বিবাহের হুকুম অবশিষ্ট থাকে না। তবে স্বামী-স্ত্রী মৃত্যুর পর একে অপরের শুধু চেহারা দেখতে পারবে। চেহারা ব্যতীত বাকি সব ক্ষেত্রে পর্দার বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে যদি স্ত্রীর কোন মাহরাম না থাকে তাহলে স্বামী তাকে কবরেও নামাতে পারবে।

আর স্বামীর ইন্তিকালের পর যেহেতু স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বহাল থাকে, কাজেই স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে দেখতে পারবে এবং স্পর্শও করতে পারবে। পুরুষ গোসলদাতা না থাকলে গোসলও দিতে পারবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১০৯৮২, ১১৯৬২, বাদায়িউস সানায়ে ১/৩০৪, ফাতাওয়া শামী ২/১৯৮, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/২৫৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৪, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ২/১৪৮৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫৮৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৪৫)

(গ) ইসলামী আইনে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রথম স্ত্রীকে জানানো বা তার সম্মতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও দুনিয়াবী আইনের কারণে প্রথম স্ত্রীকে জানিয়ে দেয়াই উচিত। অন্যথায় নানা ধরনের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বিবাহের পর স্বামীর করণীয় হল, উভয়ের হক সঠিকভাবে আদায় করা এবং রাত্রিযাপনও বণ্টন করে নেয়া। যদি খোরপোষ ও রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা বজায় না রাখে তাহলে সে কঠিন গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। (সূরা নিসা- ৩, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৭, আল-হিদায়া ১/২১৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ১৬/৭৪১, ৭৪৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৭/২২৫)

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল করীম
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৭৪ প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে যারা মাহরাম নয়, কিন্তু নিকটাত্মীয়, যেমন চাচাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন এবং চাচাতো খালা ইত্যাদি। এদের সাথে পর্দা বজায় রেখে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য কতটুকু কথাবার্তা বলা এবং খোঁজ-খবর নেয়া বৈধ হবে? উল্লেখ্য, জন্মের পর মা অসুস্থ থাকার কারণে বালেগ হওয়া পর্যন্ত চাচাতো খালার হাতেই লালন-পালন সম্পাদিত হয়। এখন তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কথাবার্তা বলার সীমা কতুটুকু?

উত্তর : আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব; তা ছিন্ন করা হারাম। হাদীসে এ ব্যাপারে অনেক তাকীদ এসেছে। এক হাদীসে এসেছে, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিক ও হায়াতে বরকত দান করেন। আর যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৮৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৫৬)

প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে চাচাতো, ফুফাতো ভাই-বোন এবং চাচাতো খালা প্রমুখ যেহেতু মাহরাম নয়; বরং নিকটতম আত্মীয়, তাই তাদের সাথে শরয়ী পর্দা বজায় রেখে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে অতি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ও কিছুদিন পরপর যেমন, সপ্তাহে বা মাসে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া বৈধ হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বর্তমান যামানা যেহেতু ফিতনার যামানা তাই কথাবার্তা ও খোঁজ-খবর নেয়া যেন অপ্রয়োজনীয় ও সংকোচহীনভাবে না হয়।

উল্লেখ্য, আপনার চাচাতো খালার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। (সূরা নিসা- ১, সূরা মুহাম্মাদ- ২২, সূরা আনফাল- ৭৫, সূরা বাকারা- ২৭, সূরা নূর- ৩১, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৩২, ৫৯৭১, ৫৯৮৪, ৫৯৮৬, ৫৯৮৮, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১৭২, ২৫৪৮, ২৫৫৬, ২৫৫৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪১০৪, ফাতাওয়া শামী ১/৪০৬, ৬/৪১১, বাদায়িউস সানায়ে ৬/১৩২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৯০)

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল করীম
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৭৫ প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের সুতরা মুসল্লীদের জন্য যথেষ্ট, বিষয়টি খোলা ময়দানের সাথে সংশ্লিষ্ট, নাকি স্বাভাবিক মসজিদ, কামরা বা ছোট জায়গাতেও একই মাসআলা?

উত্তর : জামাআতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ইমামের সুতরা সমস্ত মুসল্লীর জন্য সুতরা হিসেবে পরিগণিত হবে। চাই তা খোলা ময়দানে হোক বা স্বাভাবিক মসজিদ, কামরা বা ছোট জায়গায় হোক। (সূরা মুমিনূন- ১-২, সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৯৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩৫৯, ৪৯৩, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৯৫৪, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/৪৯৪, আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ২৪/১৭৮, আল-মুগনী ২/২৩৭, কিতাবুন নাওয়াযিল ৪/৪৬৮)

মাহমুদুল হাসান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

২৭৬ প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসায় কেউ রক্তদাতার খোঁজে এলে তাকে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ছাত্রসংগঠন খুদ্দামুত্তলাবার স্বাস্থ্যবিভাগ দাতা খুঁজে দেয়ার চেষ্টা করে। এ সময় দাতা-গ্রহীতার তথ্য লিখে একটি ফরম পূরণ করা হয় এবং ফরম বাবদ রক্ত গ্রহীতার কাছ থেকে এক'শ টাকা নেয়া হয়। দাতা খোঁজার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিভাগের সহায়তা না নিলেও ফরম পূরণ করে গ্রহীতার কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়। পরবর্তীতে এ টাকা ছাত্রদের জরুরী ঔষধ ক্রয়ের কাজে ব্যয় করা হয়। প্রশ্ন হল, রক্ত গ্রহীতার কাছ থেকে এ টাকা নেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : রক্তদাতা খোঁজার ক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করার এ ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর একটি উদ্যোগ। শৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য করলে এর প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সুস্পষ্ট। তবে এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিভাগের জন্য গ্রহীতার কাছ থেকে ঠিক ততটুকু অর্থ গ্রহণ করা জায়েয হবে, যতটুকু অর্থ দাতা অনুসন্ধানের কাজে (ফোন বিল, ভাড়া ইত্যাদিতে) সাধারণত ব্যয় হয়। এর বাইরে অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করলে সেটা রক্ত বিক্রয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। অথচ রক্ত বিক্রয় করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই।

প্রশ্নোক্ত সূরতে গ্রহীতার কাছ থেকে যে এক'শ টাকা নেয়া হচ্ছে তাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়–

(১) গ্রহীতার কাছ থেকে খরচের অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে। সাধারণত দাতা খোঁজার কাজে এত অর্থ ব্যয় হয় না।

(২) গ্রহীতাকে নফল দানে বাধ্য করা হচ্ছে।

(৩) কোন কোন সময় দাতা অনুসন্ধানের সেবা না দিয়েও অর্থ আদায় করা হচ্ছে।

(৪) ফরমে লেখা আছে, 'গরীব ছাত্রদের চিকিৎসায় ব্যয় হয়'। কিন্তু বাস্তবে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল ছাত্রের জরুরী ঔষধ কেনার কাজে ব্যয় করা হচ্ছে।

এসব কারণে রক্ত গ্রহীতার কাছ থেকে এ অর্থ গ্রহণ ও ঔষধ কেনার খাতে তা ব্যয় করা জায়েয হবে না। বরং দাতা খোঁজার সেবা প্রদান সাপেক্ষে ফরমের মূল্য ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ন্যূনতম খরচ (আনুমানিক ৫০/- টাকা) নিতে পারবে।

আর ছাত্রদের ঔষধ কেনার সেবা চালু রাখতে হলে (ক) রক্তদানের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে, (খ) সব ধরনের সেবার কথা বলে, (গ) উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে, (ঘ) সাধারণ দানের একটি ফান্ড তৈরি করা যেতে পারে। (সূরা নিসা-২৯, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৫৪৮৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪২২, ইমদাদুল আহকাম ৩/১৭৩, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৬/২১৫)

লিয়াকত খান
ধানমণ্ডি, ঢাকা

২৭৭ প্রশ্ন : (ক) নামায শেষে নামাযী ব্যক্তি ডানে বামে সালাম ফেরানোর সময় তার চেহারা কখন থেকে ঘুরাবে? এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতি জানতে চাই।

(খ) রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের জামাআত করার বিধান কি? যদি কোন মসজিদ কমিটি ঘোষণা দিয়ে রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের জামাআতের আয়োজন করে তবে এক্ষেত্রে মুসল্লীদের করণীয় কি? এতে কর্তৃপক্ষের গুনাহ হবে কি না? কেউ কেউ হারামাইন শরীফাইনের কিয়ামুল লাইলের জামাআতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন যে, ওখানে হতে পারলে আমাদের এখানে হতে সমস্যা কোথায়? দলীল-প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) নামায শেষে সালাম ফেরানোর সুন্নাত পদ্ধতি :

নামাযী ব্যক্তি উভয় সালাম ফেরানোর সময় কিবলার দিক থেকে শুরু করবে এবং 'আস-সালামু' বলা পর্যন্ত চেহারা কিবলার দিকে রাখবে। 'আলাইকুম' বলার সময় প্রথমবার ডান কাঁধের দিকে, তারপর দ্বিতীয়বার বাম কাঁধের দিকে চেহারা ঘুরাবে।

আর মুক্তাদী হলে উল্লিখিত নিয়মে ইমাম সাহেব ডান দিকে চেহারা ফেরানোর পর ডান দিকে সালাম শুরু করবে, বাম দিকে চেহারা ফেরানোর পর বাম দিকে সালাম শুরু করবে। (সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী ২/২৫৫, শরহুল মুহাররার ফিল-হাদীস ৮/৩৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৬, ৭৭, ফাতাওয়া শামী ১/৫২৪, আল-বাহরুর রায়িক ১/৩১৮, মারাকিল ফালাহ শরহু নূরিল ঈযাহ; পৃষ্ঠা ৯৫, আল-মুহীতুল বুরহানী ১/৩৬৯, আল-মাবসূত ১/৩০, দুরারুল হুক্কাম ১/৭৯, ফিকহুল ইবাদত আলাল মাযহাবিল হানাফী; পৃষ্ঠা ৮৮)

(খ) কিয়ামুল লাইলের নামায নফল। আর নফল নামায জামাআতের সাথে আদায় করা মাকরূহ। চাই রমাযান মাসে হোক বা অন্য যে কোন মাসে হোক।

যদি কোন মসজিদ কমিটির সদস্য ঘোষণা দিয়ে রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের জামাআতের আয়োজন করে তাহলে মুসল্লীদের করণীয় হলো, তারা জামাআতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এবং যারা জামাআতে শরীক হবে তারা গুনাহগার হবে।

আর হারামাইন শরীফাইনের অধিকাংশ ইমাম হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। হাম্বলী মাযহাব মতে জামাআতের সাথে কিয়ামুল লাইল আদায় করা মাকরূহ নয়।

কিন্তু একজন হানাফী মুসল্লীর জন্য শরীয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া কোন মাসআলায় নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব অনুসরণের অবকাশ নেই। কেননা অমুজতাহিদ ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত মুজতাহিদের অনুসরণ করা জরুরী। অমুজতাহিদ কর্তৃক মাযহাব অনুসরণ না করা বা যখন খুশি মাযহাব পরিবর্তন করার অর্থ হলো, শরীয়ত বাদ দিয়ে নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা। কুরআন-সুন্নাহর বিধান মতে খেয়াল-খুশির অনুসরণ নাজায়েয ও গোমরাহী। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৬, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ১/২৯, ফাতাওয়া শামী ১/৪৫৬, ২/৪৮, বাদায়িউস সানায়ে' ১/২৯০, আল-বাহরুর রায়িক ২/৭৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৬, ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ৩৪০, ৩৫৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/১৩৬, আল-মুগনী ২/১০৪, আল-ইকনা' ফী ফিকহিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ১/১৫২)

আবু বকর সিদ্দীক
আমিন বাজার, ঢাকা

২৭৮ প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদে মুআযযিন সাহেব ৬.৪০ মিনিটে মাগরিবের আযান শুরু করে দেয়। ফলে এলাকার অনেকেই আযান শুনে ইফতার করে ফেলে। অথচ ইফতারের ওয়াক্ত ক্যালেন্ডারে ৬.৪৪ মিনিটে লেখা আছে। প্রশ্ন হলো, এ অবস্থায় যারা আযান শুনে ইফতার করেছে তাদের ঐ দিনের রোযা বাতিল হয়ে গেছে, নাকি ক্যালেন্ডারে যে

সতর্কতামূলক কিছু সময় অতিরিক্ত লেখা হয়, সে ভিত্তিতে রোযা সহীহ হয়ে গেছে? যদি রোযা বাতিল হয়ে থাকে, তাহলে রোযার কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টি করতে হবে, নাকি শুধু কাযা করলেই চলবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে যারা আযান শুনে ৬.৪০ মিনিটে ইফতার শুরু করেছিলো, তারা সময়ের পূর্বেই ইফতার করেছে। আর ক্যালেন্ডারে যে সতর্কতামূলক কিছু সময় অতিরিক্ত লেখা হয় তা বাদ দিলেও ঐ সময়ে ইফতারের সময় হয়নি। কারণ ঐ দিন ইফতারের মূল সময় ছিলো ৬.৪১ মিনিট, এরপর থেকে ৩ মিনিট সতর্কতামূলক সময় ধরে ৬.৪৪ মিনিট লেখা হয়েছে। সে হিসেবে তারা ইফতারের মূল সময়ের ১ মিনিট পূর্বেই ইফতার করে ফেলেছে। সুতরাং তাদের ঐ দিনের রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল। কাজেই যারা মুআযযিনের আযান শুনে সাথে সাথেই ইফতার করা শুরু করেছে, তারা সতর্কতামূলক ঐ দিনের রোযার কাযা করে নিবে; তাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৫১৮, ফাতাওয়া শামী ২/৪০৫, ৪০৬, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪৫-৪৪৬)

আব্দুস সালাম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৭৯ প্রশ্ন : (ক) কেউ যদি শুধু এ কথা বলে, 'আমি যদি এ কাজটা করি, তবে আমার উপর কাফ্ফারা হবে', পরে সে ঠিকই কাজটি করে ফেলে, তাহলে তার বিধান কী?

(খ) আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যাংকার। মাঝে মধ্যে সে এমন অনেক কিছু হাদিয়া দেয়, যা নিত্য প্রয়োজনীয়। হাদিয়া দেয়ার পর সে ঐ জিনিস ব্যবহার করেছি কি না, জিজ্ঞাসাও করে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

(গ) ঈদের নামাযে মাসবূক হলে বাকি নামায কিভাবে আদায় করবে?

(ঘ) চেয়ারে বসে নামায আদায়কালে মুক্তাদির পা ইমামের পা থেকে আগে বেড়ে গেলে তার নামায হবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : (ক) 'আমি যদি এ কাজ করি, তবে আমার উপর কাফ্ফারা হবে' কথাটি বলার কারণে শপথ সংঘটিত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে কাজটি করায় তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ দশজন গরীব-মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়াবে বা মধ্যম মানের এক জোড়া করে কাপড় দিবে। এগুলোর সামর্থ্য না থাকলে লাগাতার তিনদিন রোযা রাখবে। (ফাতাওয়া শামী ৩/৭০২, ৭২৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৫৭, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৭/৩০০)

(খ) সুদী ব্যাংকে চাকরীজীবির বেতন হালাল নয়। কাজেই কোন ব্যাংকারের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, তার বিকল্প কোন হালাল আয়ের উৎস নেই বা তার অধিকাংশ আয় ব্যাংকের বেতন বাবদ অর্জিত কিংবা তার দেয়া হাদিয়াটি হারাম উপার্জনের টাকা থেকেই দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। তবে বাধ্য হয়ে কখনো গ্রহণ করতে হলে তা ব্যবহার না করে কোন গরীবকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া শুধু দায়মুক্তির নিয়তে দান করে দিবে। আর ব্যবহার করতে বাধ্য হলে অনুমান করে তার বাজার মূল্য দান করে দিবে।

পক্ষান্তরে যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, হাদিয়াটি সে হালাল উপার্জন থেকে দিয়েছে অথবা তার অধিকাংশ আয় হালাল উৎস থেকে অর্জিত হয়, তবে তা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া শামি ৬/৩৭৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪২০, আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩৪/২৪৫)

(গ) ঈদের নামাযে মাসবূক যদি প্রথম রাকআতে অতিরিক্ত তাকবীরের পরে শরীক হয়, তাহলে ইমামের কিরাআত পড়া অবস্থায় সে তাকবীরগুলো একা একা দিয়ে নিবে। আর যদি রুকু অবস্থায় শরীক হয়, তবে তাকবীরে তাহরীমা বলার পরে সম্ভব হলে তাকবীরগুলো বলে রুকুতে যাবে। অন্যথায় রুকুতে গিয়ে হাত উঠানো ব্যতীত তাকবীরগুলো বলবে। তাছাড়া প্রথম রাকআত না পেলে পরে প্রথম রাকআত আদায়কালে আগে কিরাআত পড়ে রুকুর পূর্বে তাকবীর দিবে। তবে যদি আগে তাকবীর দিয়ে পরে কিরাআত পড়ে, তবুও আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/১৭৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/১৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬)

(ঘ) চেয়ারে বা ফ্লোরে বসে নামায আদায়কারীর পা ইমামের পা থেকে আগে বেড়ে গেলে তার নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। তবে তার নিতম্ব ইমামের পা থেকে আগে বেড়ে গেলে তার নামায সহীহ হবে না। (আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৬/২১)

মাওলানা এম. হাসান
ফরিদপুর

২৮০ প্রশ্ন : আমরা জানি যে, উযূ ও পবিত্রতা ছাড়া কুরআনে কারীম স্পর্শ করা যায় না। এ বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট দলীল হলো, সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত-
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

সম্প্রতি আমাদের এলাকার এক মাহফিলে জনৈক আলেম তার বয়ানে দাবী করেন যে, 'এই আয়াতে পবিত্র কুরআন বলতে লওহে মাহফূযের কুরআন বোঝানো হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার কুরআন গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় স্পর্শ না করা গেলেও উযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে।'

এখন আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সঠিক? আর ঐ আয়াতে কুরআন বলতে লওহে মাহফূযের কুরআন বোঝানো হয়েছে মর্মে কোন বর্ণনা আদৌ আছে কি না? যদি থাকে তাহলে সে বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? সেটা আমলযোগ্য কি না? যদি এটা কোন আমলযোগ্য কথা না হয়ে থাকে তাহলে এমন কথা বর্ণনাকারী আলেমের বয়ান শোনার বিধান কি?

উত্তর : সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত- لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এর মধ্যে مُطَهَّرُونَ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের একটি বড় জামাআতের নিকট مُطَهَّرُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা; যারা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আনাস রাযি., মুজাহিদ রহ., ইকরামা রহ. ও সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত। ইমাম মালেক রহ.ও এই তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

আর কিছু মুফাসসিরীনে কেরামের নিকট এর পূর্বের আয়াতের قرآن শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুসহাফ যা আমাদের হাতে রয়েছে। আর مُطَهَّرُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত লোক যারা যাহেরী-বাতেনী অপবিত্রতা অর্থাৎ ছোট ও বড় নাপাকী থেকে পবিত্র। ছোট নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য উযূ না থাকা, অর্থাৎ যে নাপাকী থেকে উযূ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়। বড় নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য জানাবাত, হায়েয ও নেফাস; যেগুলো থেকে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হয়। হযরত সালমান ফারসী রাযি. আয়াতের এই অর্থই বুঝেছেন। হযরত আতা রহ. এই তাফসীরকে সুস্পষ্ট বলেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এই তাফসীরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য হল, কুরআন শরীফ পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয নেই। আর পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্যিক অপবিত্রতা

থেকে হাত পবিত্র হতে হবে, উযূ থাকতে হবে এবং জানাবাত থেকেও পবিত্র থাকতে হবে।

সুতরাং আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে দু'টি তাফসীরই বর্ণিত আছে। তবে আয়াতের তাফসীর যেটাই হোক, শুধুমাত্র দাউদ যাহেরী রহ. ছাড়া সবাই এ কথার উপর একমত যে, পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না। কেননা এ আয়াত ছাড়াও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস রয়েছে, যেখানে পবিত্রতা ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। উদাহরণত–

عن حكيم بن حزام ان النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه واليا الى اليمن قال: لا تمس القران الا وانت طاهر.

অর্থ : হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন, পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৬০৫১)

এছাড়াও হযরত উমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, উযূ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই।

عن أنس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيف فقيل له إن ختنك وأختك قد صبوا فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرؤون طه فقال أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرأه وكان عمر يقرأ الكتاب فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أوتوضأ فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه.

অর্থ : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. একদিন খোলা তরবারী হাতে নিয়ে বের হলেন। তাকে বলা হলো, তোমার ভগ্নিপতি ও তোমার বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি তাদের কাছে আসলেন। তাদের নিকট একজন মুহাজির সাহাবী উপস্থিত ছিলেন; যার নাম খাব্বাব রাযি.। তারা সূরা ত্ব-হা তিলাওয়াত করছিলেন। উমর রাযি. তাদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট যে কিতাব (কুরআন শরীফ) আছে তা আমাকে দাও; আমি পড়বো। উত্তরে তার বোন বললেন, তুমি অপবিত্র; আর এ কিতাব পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না। তুমি গোসল অথবা উযূ করে এসো। উমর রাযি. উযূ করে আসলেন এবং কিতাব নিয়ে পড়া শুরু করলেন। (সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ৪৪১)

এছাড়াও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আমর ইবনে হাযম রাযি.-এর নিকট অর্পণ করা চিঠিতেও পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সুতরাং উক্ত আলেম সাহেবের বক্তব্য 'এই আয়াতে পবিত্র কুরআন বলতে লওহে মাহফূযের কুরআন বোঝানো হয়েছে। অতএব দুনিয়ার কুরআন জানাবাত অবস্থায় স্পর্শ না করা গেলেও উযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে' সঠিক নয়; বরং কুরআন শরীফ যেমনিভাবে জানাবাত অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না তদ্রূপ উযূ ছাড়াও স্পর্শ করা নাজায়েয। এটা তার অজ্ঞতা কিংবা হঠকারিতা। এ জাতীয় সর্বসম্মত মাসআলার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর কথা বর্ণনাকারী আলেম থেকে সতর্ক থাকা উচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বিভ্রান্তি প্রচারকারী শরীয়তমতে ফাসিক হবে; তার ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী হবে। সূরা ওয়াকিয়া- ৭৭-৭৯, সূরা নিসা- ১১৫, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৩৭৮২, ৬০৫১, সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ৪৪১, মুসনাদে ইবনে জা'দ; হা.নং ২৩৬৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৭/৫৪৪, ৫৪৫, তাফসীরে মাযহারী ৯/১৮১, ফাতাওয়া শামী ১/৮৯, আল-মুগনী ১/১০৮, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৮/২৮৬)

তাকমীল জামাআতের ছাত্রীবৃন্দ
নূরে হেরা মহিলা মাদরাসা, ঢাকা

২৮১ প্রশ্ন : বর্তমানে মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের টিউব মেহেদী পাওয়া যায়। সেগুলোর আবার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন, এক ধরনের মেহেদী আছে, যা হাতে লাগানোর সাথে সাথে রং হয়ে যায়; বেশি সময় রাখলে তা গাঢ় রং ধারণ করে। তবে কিছুদিন পর যখন হালকা হতে থাকে তখন রংগুলো আবরণের মতো উঠে যেতে থাকে বা নখ দ্বারা উঠানো যায়। এ জাতীয় মেহেদী হলো, মমতাজ, স্মার্ট, রাঙাপরী, এলিট ইত্যাদি। আরেক ধরনের মেহেদী আছে যা লাগানোর সাথে সাথে গাঢ় রং হয় না; বরং একেবারেই হালকা কমলা আকৃতির রং হয়। ধীরে ধীরে একদিন পরে তা গাঢ় হয়। দুই তিনদিন পরে যখন হালকা হয়ে চলে যেতে থাকে তখন তাতেও কিছুটা আবরণ দেখা দেয়। তবে প্রথম প্রকারের মেহেদীর তুলনায় কম। যেমন আলমাস, আনাস, কাভেরী ইত্যাদি।

উভয় প্রকারের মাঝে পার্থক্য হলো, প্রথম প্রকার লাগানোর সাথে সাথেই গাঢ় রং ধারণ করে আর দ্বিতীয়টি সাথে সাথে গাঢ় রং হয় না; বরং ধীরে ধীরে রং হয়। আমাদের প্রশ্ন হল, এমতাবস্থায় আমাদের এসব মেহেদী ব্যবহার করা ঠিক হবে কি না? এবং তা ব্যবহার করে উযূ-গোসল বা পবিত্রতা অর্জন হবে কি না? অর্থাৎ আবরণের ভিতর পানি পৌঁছবে কি না? জানালে খুব উপকৃত হবো।

উত্তর : হ্যাঁ, এসব মেহেদী ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে কোন সমস্যা নেই। তবে প্রশ্নে যে আবরণের কথা বলা হয়েছে তা মেহেদীর রঙের কারণে নয়; বরং মেহেদীর মধ্যে যে কেমিক্যাল রয়েছে তাতে হাতের চামড়া ঝলসে যায় যা তিন চার দিন পর আবরণের মতো করে উঠতে থাকে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪, ফাতাওয়া শামী ১/১৫৪, আল-বাহরুর রায়িক ১/৪৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ৩/১০১)

ইনআমুল হক (ইনাম)
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

২৮২ প্রশ্ন : মুহতারাম! আমার স্ত্রী ১ মাস ১০ দিনের গর্ভবতী। এদিকে আমার ১ বছর ৩ মাস বয়সী একটি বাচ্চা আছে। এখন যদি আমার স্ত্রীর বাচ্চা হয়, তাহলে আমার পূর্বের বাচ্চার লালন-পালন ও দুধপানে সমস্যা হতে পারে। এমতাবস্থায় গর্ভের বাচ্চাটিকে ওষুধ ইত্যাদির মাধ্যমে ফেলে দেয়া বৈধ হবে কি?

উত্তর : আপনার স্ত্রীর বিষয়টি নিয়ে দীনদার অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। ডাক্তার যদি গর্ভের বাচ্চাটিকে রেখে দেয়া আপনার স্ত্রী এবং তার ছোট বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর মনে করেন এবং বাচ্চাটি ফেলে দেয়া জরুরী মনে করেন, তাহলে গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ১২০ দিন (তথা বাচ্চার মধ্যে রূহ আসার পূর্ব পর্যন্ত) সময়ের মধ্যে বাচ্চা ফেলে দেয়ার অবকাশ রয়েছে। এতে গুনাহ হবে না।

পক্ষান্তরে ডাক্তার যদি গর্ভের বাচ্চা রেখে দেয়া ক্ষতিকর হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত দেয় এবং ফেলে দেয়া জরুরী মনে না করে, তাহলে কোন অবস্থাতেই গর্ভের বাচ্চা ফেলে দেয়া বা নষ্ট করে দেয়া জায়েয হবে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৪৩, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৪১০, ফাতাওয়া শামী ৬/৪২৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৫৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২০২-২০৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২৫৫, কিতাবুল ফাতাওয়া ৬/২১৬)

মুহাম্মাদুল্লাহ
দারুল উলূম, খুলনা

২৮৩ প্রশ্ন : মাদরাসাগুলোতে বিভিন্ন সময় ছাগল, বকরী ইত্যাদি এসে থাকে। দেখা যায়, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রকেই নির্বিশেষে তা থেকে খাইয়ে

দেয়। প্রশ্ন হলো, সকল ছাত্রকে এভাবে খাওয়ানো যাবে কি না? বা কোন দূরবর্তী হিলা আছে কি না, যার মাধ্যমে সবার জন্য খাওয়া বৈধ বলে সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : মাদরাসাগুলোতে বিভিন্ন সময়ে যে ছাগল, বকরী ইত্যাদি দান করা হয়, সাধারণত এগুলো মান্নত ও সদকার হয়ে থাকে। যদি মান্নত তথা ওয়াজিব সাদকার হয়, তাহলে তার হকদার শুধুমাত্র সে সমস্ত তালিবে ইলম, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে গরীব। একই সঙ্গে ঐ সকল স্টাফও এর হকদার যারা গরীব তালিবে ইলমের খেদমতে নিযুক্ত। সুতরাং ধনী তালিবে ইলম, ধনী পিতার নাবালেগ সন্তান কিংবা উস্তাদদেরকে তা খাওয়ানো জায়েয হবে না।

তবে যদি কোন গরীব বালেগ তালিবে ইলমকে ছাগল, বকরী ইত্যাদির নিঃশর্ত মালিক বানিয়ে দেয় হয় এবং সে নিজ মালিকানা বুঝে নিয়ে স্বেচ্ছায় তা মাদরাসায় দান করে, (তবে এমনটা সাধারণত হয় না; কারণ ঐ ছাত্র মনে করে যে, এটা মাদরাসায় ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই আমাকে দেয়া হয়েছে বা আমি এটা ব্যক্তিগত খরচ করতে পারবো না। সুতরাং তা সঠিকভাবে দিতে হবে।) তাহলে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল ছাত্র, শিক্ষক ও স্টাফরাও তা খেতে পারবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই।

আর যদি ছাগল, বকরীটি নফল সাদকার হয়ে থাকে অর্থাৎ সাধারণ দান, তাহলে ধনী-গরীব সকল ছাত্র, শিক্ষক ও স্টাফরা তা থেকে খেতে পারবে। (সূরা তাওবা- ৬০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৯, ৪৩৯, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৪৩, বাদায়িউস সানায়ে ২/৪৭, ১৫৭, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ২৪/৩৩২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২/১৩৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৭/১১৮)

মাহফূজুর রহমান
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

২৮৪ প্রশ্ন : ১. মসজিদে মান্নত করার বিধান কি?

২. মসজিদে কোন খাদ্যদ্রব্য মান্নত করলে তা পুরা করা জরুরী কি না?

৩. মসজিদে কৃত মান্নতের খাবার সাধারণ মুসল্লীরা খেতে পারবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন?

উত্তর : ১. মসজিদে মান্নত করার দুই সূরত–

প্রথম সূরত : মসজিদ বা তার কোন অংশবিশেষ নির্মাণ করা কিংবা নগদ অর্থ দান করার মান্নত করা।

দ্বিতীয় সূরত : মসজিদে মুসল্লীদের কোন খাবার খাওয়ানোর মানত করা।

প্রথম সূরতের হুকুম : এ ধরনের মান্নত শরীয়তমতে মান্নত নয়; বরং নফল দানের নিয়ত হিসেবে গণ্য হবে। সামর্থ্য থাকলে এ নিয়ত পূর্ণ করা উচিত।

দ্বিতীয় সূরতের হুকুম : এক্ষেত্রে মান্নত সহীহ হবে। তবে উক্ত খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই মান্নত পুরা করা জরুরী নয়; বরং ঐ পরিমাণ নগদ টাকা ফকীর-মিসকীনকে দান করে দিলেও আদায় হয়ে যাবে।

২. মসজিদের গরীব মুসল্লীদের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্যের মান্নত করলে তা সহীহ হয়ে যাবে। তবে ঐ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পুরা করা জরুরী নয়।

৩. মসজিদে মান্নতের খাবার সাধারণ মুসল্লীদের মধ্য থেকে ধনী ব্যক্তিরা খেতে পারবে না। কেবল যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত মুসল্লীরাই খেতে পারবে। (সূরা হজ্জ- ২৯, বাদায়িউস সানায়ে' ৫/৮২, ফাহতুল কাদীর ৫/৯১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৩৯, ৪/৪১, ৬/৩৩৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২/১২৫, ১৩৬)

ইশরাক আহমাদ
সি খিলগাঁও, ঢাকা

২৮৫ প্রশ্ন : ছেলে-মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষ থেকে কোন প্রকার চাপের সম্মুখীন না হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ছেলেপক্ষের কিছু ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দিয়ে আয়োজন করে খাওয়াতে চায় তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অসুবিধা আছে?

অনেকে বলে, বিয়েতে মেয়েপক্ষের তরফ থেকে যে কোন ধরনের আপ্যায়ন-আয়োজন শরীয়ত বহির্ভূত এবং গুনাহের কাজ। তাদের একথা কতটুকু সঠিক? দলীলসহ জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : ইসলাম বিবাহ-শাদীকে খুবই সহজ করেছে। উভয় পক্ষের ঈজাব-কবুলের সময় শুধুমাত্র দু'জন সাক্ষীই বিবাহের আকদ সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর ছেলে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের এবং শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ওলীমা করবে। ইসলামে এটি সুন্নাত। আর যদি তার সামর্থ্যই না থাকে তাহলে না করলেও বিবাহের কোন সমস্যা হবে না। আর এক্ষেত্রে ইসলাম মেয়েপক্ষকে কোন আয়োজনের উৎসাহ প্রদান করেনি।

বর্তমান সমাজে ছেলেপক্ষের বা সমাজের চাপে পড়ে, লোক দেখানোর জন্য, গর্ব ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে, কেবলমাত্র রসম-রেওয়ায পালন উপলক্ষে কিংবা ওলীমার মত সুন্নাত মনে করে মেয়েপক্ষ যে অনুষ্ঠান করে থাকে এবং এটাকে বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এসব কাজ শরীয়তবিরোধী।

বাস্তবতা হলো, উপরোক্ত শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থেকে বিয়ের পর যে কোন সময় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে ছেলেপক্ষেরও দু-চারজন ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করে এবং আয়োজন করে খাওয়াতে চায়, তাহলে তা নাজায়েয হবে না।

অতএব এটির প্রতি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়ের মত কঠোর মনোভাব রাখা এবং গুনাহের কাজ মনে করা ঠিক নয়। তবে আমাদের সমাজে যেহেতু এটি একটি আবশ্যক রসমে পরিণত হয়ে গেছে, সেহেতু এর থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা উচিত। (মা'আলিমুস সুনান ৪/২৪০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৭/৩৯৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৭/৫২২, ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ৫৫৪)

শরীফুল ইসলাম
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

২৮৬ প্রশ্ন : দু'জন শরীক মিলে যৌথভাবে ব্যবসা করে। তাদের মূলধন এবং লভ্যাংশ সমান সমান। জানার বিষয় হল, উক্ত দুই শরীকের মধ্য হতে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন দিয়ে 'আজীর' রাখা জায়েয হবে কি না?

উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে আমাদের আকাবিরদের ফাতাওয়ার কিতাবগুলোতে দুই রকমের মতামতই পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেউ জায়েয বলেছেন আর কেউ নাজায়েয বলেছেন । আমাদের দেশের প্রচলন অনুযায়ী আমরা কোন মতের উপর আমল করবো?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত মাসআলায় ইমামদের মতানৈক্য থাকলেও হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, দুই শরীকের একজনের বেতন ধার্য করে 'আজীর' হিসেবে রাখা বৈধ নয়।

তবে বৈধ পন্থা হল, যিনি ব্যবসার কাজ আঞ্জাম দিবেন তার লভ্যাংশ বেশি নির্ধারণ করা। লভ্যাংশ বণ্টনের পূর্বেই কোন প্রয়োজনে তাকে নগদ অর্থ দিতে হলে তা অগ্রিম হিসেবে নেয়া এবং চূড়ান্ত হিসাবের সময়ে সমন্বয় করে নেয়া উচিত। (ফাতাওয়া শামী ৪/৩১২, ৬/৫৭, ৬০, আল-হিদায়া ৩/২৪০, ২৪১, ইমদাদুল আহকাম ৩/৩৪০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/১৮৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫১৭, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২০/৫৭)

গোশত খাবেন, গোশত? মানুষের গোশত!

আব্দুল্লাহ ইউসুফ

কী, চমকে গেলেন? আমিও আমার বন্ধুর এমন কথা শুনে চমকে গিয়েছিলাম, থমকে গিয়েছিলাম, আবার হাসিও পেয়েছিল। বলে কী? ও জিজ্ঞেস করেছিল, গোশত খাবি? মানুষের গোশত? আমি বললাম, মানুষের গোশত? ধুর, তা-ও আবার হয় নাকি? ও বলল, হয়। পথেঘাটে দেখিস না, মানুষ কত একে অন্যের গোশত দেদারসে খেয়ে বেড়াচ্ছে? আমি বললাম, মানে? সে বলল, আরে বুদ্ধু, মানুষ কত গীবত করে বেড়ায়, জানিস না? চলতে চলতে, আড্ডা দিতে বসলে, চায়ের দোকানে চা-পান-সিগারেট খাওয়ার ফাঁকে, এমনকি আমরা মাদরাসার লাইনে যারা আছি, তারাও একে অন্যের গোশত খাওয়ায় কম পটু না। কুরআন শরীফে যে এটাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, তা তো তুই জানিসই।

আমার আয়াতটা মনে পড়ল, 'তোমরা একে অন্যের দোষচর্চা করো না। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে? তোমরা এটা অপছন্দ করবে।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১২)

কোন্ বুযুর্গ জানি বলেছেন, গীবত না, ঘি+ভাত। আজকাল মানুষ এমনভাবে গীবত করছে, যেন ঘি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। ঘি দিয়ে ভাত খাওয়া যেমন মজাদার ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উন্নতিকারক, তেমনি গীবতের মজা নিয়ে আমরা গুনাহের খাতার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে চলেছি। জনসাধারণ, এমনকি আফসোস হলেও সত্য, কিছু আলেমও এতে জড়িয়ে পড়েছে।

জীবনের কোন ক্ষেত্র এর থেকে খালি নয়। একজন লোক অফিসে বসের সুনজরে আছে, প্রমোশন পেয়েছে। তাকে ঘিরে অন্যদের কথা চালাচালির শেষ নেই। একজন বক্তা জনপ্রিয়তা পেলে অপর বক্তাদের মাঝে তাকে নিয়ে চলতে থাকে নানা কানাঘুষা। নতুন এক হুযূর। মাদারাসায় যোগ দিয়েই ছাত্রদের মন জয় করে নিয়েছেন। বোঝানোর ক্ষমতা ভালো। ব্যস, তার সহশিক্ষকদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। এক মহিলা কারো ঘরের কোন দোষ কিংবা ভুল দেখল। সেটা অন্য কারো কাছে না বলা পর্যন্ত পেটের ভাত হজম হয় না। এক ব্যবসায়ী আরেক ব্যবসায়ীর দোষচর্চা করে বা তার মালের দুর্নাম করে বেড়ায়। এক ছাত্র আরেকজনের পেছনে লেগে লেগে কখনো তাকে মাদরাসাই ছাড়তে বাধ্য করে।

আর রাজনীতির ময়দানে তো কথাই নেই। বিপক্ষ দলের লোকদের দোষচর্চা রাজনীতির অঙ্গনের একটি মূলনীতিই বলা যায়। বর্তমানে এর সাথে যুক্ত হয়েছে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। তাবলীগ গীবতের একটি বিশাল প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। তাবলীগের পুরোনো সাথীরা, যারা সা'দ সাহেবের পক্ষে রয়েছেন, পারলে উলামায়ে কেরামকে কাফের ফাতওয়া দিয়ে দেন।

–ভাই! আমাদের ইমাম সাহেব তো গোমরাহ হয়ে গেল!

–আরে! আমাদের ইমাম সাহেব তো চিল্লাও লাগায় নাই। অথচ এখন....

–কতবড় দুঃসাহস উনাদের, দেখছেন? আলমী আমীর সা'দ সাহেবের বিরোধিতা করে। নিযামুদ্দীনকে মারকায মানে না! এতাআত করে না!!

–ভাই! কপাল পুড়লে এমনই হয়।

এ ধরণের হাজারো কথায় উলামায়ে কেরাম জর্জরিত।

আরে মিয়া! আপনার গীবত করতে মন চাইলে নিজের মায়ের গীবত করেন। বাপের গীবত করেন। তারা আপনাকে কত কষ্ট করে বড় করেছে, কত ত্যাগ স্বীকার করেছে। আপনি যে গীবত করে আপনার সাওয়াবগুলো গীবতকৃত ব্যক্তির আমলনামায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তো সেটা আপনার মা-বাপের আমলনামায় পাঠান। আপনার উপর যাদের অনুগ্রহ আছে, তাদের গীবত করে নিজের সাওয়াবকে তাদের আমলনামায় পাঠান। শুধু শুধু উলামায়ে কেরাম বা অন্য মানুষের গোশত কেন খাবেন?

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে উলামায়ে কেরাম যে সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছেন, তার ভুল ধরছেন– এটা গীবত হবে না? এর উত্তর বর্তমান যামানা থেকে প্রায় সাড়ে সাতশ বছর আগে ইমাম নববী রহ. দিয়ে গেছেন যে, ছয়টি প্রেক্ষিতে গীবত করা জায়েয আছে। এর মধ্যে একটি হল, মুসলমানদেরকে দীনী বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য, যেটা বর্তমানে সা'দ সাহেবের ভুল থেকে প্রত্যাবর্তন না করার কারণে খুবই জরুরী।

বর্তমানে গীবত একটা আর্টে পরিণত হয়েছে, একটা শিল্পতে রূপান্তরিত হয়েছে। যে যত রসকস দিয়ে, রঙঢঙ করে বেশি পরিমাণে গীবত করতে পারবে, সে তত বড় শিল্পী। আর রাজনীতির ময়দানে তো ফলাও করে এর প্রচার করা হয়, এ নিয়ে গর্ব করা হয় যে, আমাদের অমুক নেতা বিরোধী দলের অমুকের অবস্থা একেবারে হালুয়া টাইট করে দিয়েছে। অমুকের প্যান্ট তো একেবারে পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়েছে। তাই আসুন, গীবত পরিহার করি। আগে যা করেছি, তা থেকে তাওবা করে, গীবতকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকলে তার থেকে মাফ নিয়ে সামনে না হয় আর গীবত না-ই করলাম। খাওয়ার সময় তো ছাগল-গরু-মুরগীর গোশত খাই-ই। কিংবা আর্থিক কারণে যদি না-ও খেতে পারি, তো না-ই খেলাম। তাই বলে মানুষের গোশত খেতে হবে? তা-ও আবার মৃত ভাইয়ের গোশত?

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইউসুফ
ইফতা, দ্বিতীয় বর্ষ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

প্রিয় কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে

তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। বাংলা স্যার ফররুখ আহমদের লেখা 'বৃষ্টি' কবিতা পড়ানোর সময় কবি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ভাষণের বেশিরভাগই ছাত্রদের মাথার ওপর দিয়ে গেল, মগজ স্পর্শ করলো না। স্যার তার ভাষণের মাঝখানে 'রেনেসা' শব্দটা বারবার বলছিলেন। তখনও পর্যন্ত 'রেনেসা' শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো না। কিন্তু ফররুখের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এবং তার বিখ্যাত 'লাশ' কবিতাটিও মুখস্থ ছিল।

স্যারের ফররুখপ্রীতি দেখে সাহস হলো। দাঁড়িয়ে বললাম, 'স্যার, ফররুখ আহমদের একটা কবিতা আমার মুখস্থ আছে। স্যার আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'শোনা দেখি'। আমি চোখ বন্ধ করলাম। (সিরিয়াসভাবে কাউকে কিছু শোনাতে গেলে আমার চোখ দু'টো আপনাতেই বন্ধ হয়ে যায়) গলা ছেড়ে আবৃত্তি করতে লাগলাম।

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেলো মোড়,
কালো পিচঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়।
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোন দিন রাখে না সে মৃতের খবর।
জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরনীর পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ির তাপে পড়ে আছে
নিসাড় নিথর

আবৃত্তি শেষ করে হাসি হাসি মুখে স্যারের দিকে তাকালাম। শুরুতে স্যারের চোখে আগ্রহ থাকলেও আবৃত্তি শেষে তাকে অবাক হতে দেখলাম না। তিনি স্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল, ক্লাস থ্রিতে পড়া একজন ছাত্রের এরকম জটিল কবিতা মুখস্থ থাকার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। শুধু বললেন, 'স্কুল ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবি।'

ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার (শুধু আমার না, আমার অন্যান্য ভাইবোনকেও) পরিচয় করিয়ে দেন আমার দাদা। তিনি ছিলেন ফররুখের মহাভক্ত। ১৯৪৫ সালের ফররুখ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদীর অনেকগুলো সংখ্যাও তার জোগাড়ে ছিল। ছোট বয়সে আমরা ভাইবোনেরা যখন দাদাকে গল্প বলার জন্য ধরতাম, তখন তিনি আমাদেরকে ফররুখের কবিতা শোনাতেন। দাদার গলা ভালো ছিল। আমরা আগ্রহ নিয়ে শুনতাম এবং মাঝেমধ্যে দাদার আদেশে নিজেরাও মুখস্থ করে শোনাতাম (অবশ্যই তা ছিল দাদার দেয়া লজেন্সের লোভে)। এভাবে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, ছোট থেকেই ফররুখের সঙ্গে একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

ফররুখ আহমদের নাম শুনলে মানুষের মনে প্রথম যে কথাটা আসে তা হল, ফররুখ ইসলামী রেনেসাঁর কবি। তিনি ইসলামী পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখতেন। 'সাত সাগরের মাঝি', 'পাঞ্জেরী' কবিতাগুলো পড়ে এটা মনে হবারই কথা। ইসলামী রেনেসাঁর পাশাপাশি ফররুখ একজন মানবতাবাদী কবি ছিলেন। তিনি মানুষকে নিয়ে ভাবতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে পীড়া দিত। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তার রচিত 'লাশ' কবিতা না পড়ায় তা অনেকেরই অজনা। ফররুখ আহমদ বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে তাঁর কবিতায় প্রচুর উর্দু, ফারসী ও আরবী শব্দ ব্যবহার করতেন। 'ডাহুক' কবিতা পড়লে এক অন্য ফররুখকে জানা যাবে। শেষরাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একনিষ্ঠ যিকির-সাধনাকে তিনি ডাহুকের ডাক বলে অভিহিত করেছেন। এ কবিতার ছন্দ, অলংকার, শব্দচয়ন, উপমাকৌশলে বিদগ্ধ পাঠক বিমোহিত না হয়ে পারে না। কবিতাটির কয়েকটি ছত্র এই–

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদিঘী অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি
ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।

বৈশাখের আগমন সম্পর্কে তাঁর লেখা 'বোশেখ' কবিতাটিও পাঠকের ঘাম ঝরিয়ে ছাড়বে।

শিশু-কিশোরদের জন্য ফররুখ যথেষ্ট লিখেছেন। গ্রন্থগুলোর প্রতিটি কবিতাই চমৎকার। বাংলা ভাষায় বৃষ্টি নিয়ে লেখা সেরা কবিতাগুলোর মধ্যে তাঁর লেখা 'বৃষ্টি' কবিতাটা শুরুর দিকে আছে। 'পাখির বাসা', 'চাঁদের আসর' ও 'ফুলের জলসা' এই তিনটি বই বাংলা স্যার আমাকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। ('লাশ' কবিতা শোনার পর বাংলা স্যার দেখা করতে বলেছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়ই)। 'পাখির বাসা' কাব্যগ্রন্থের জন্যে কবিকে ইউনেস্কো পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সাহসী মানুষেরা জীবনের কাছে হেরে যান কিন্তু নিজেদের আদর্শ থেকে পিছু হটেন না। ফররুখ আহমদের সঙ্গেও এমনটি হয়েছিল। ঘুনেধরা সমাজের যাবতীয় ভ্রষ্টতা, পাপাচার, মিথ্যা অহমিকা ও জড়তার মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ও সাহসী কলমটি শেষ বয়সে এসে জীবনের কাছে হেরে গেছেন।

তোরা চাসনে কিছু খোদার মদদ ছাড়া,
তোরা পরের ওপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

তাঁর তৈরি এই লাইন দু'টো জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার', 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' এবং আদমজী পুরস্কার পাওয়া এই কবি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায়, অর্থকষ্টে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর পর পাওয়া 'একুশে পদক', 'স্বাধীনতা পুরস্কার' ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার তার মৃত্যু-চিকিৎসায় কাজে আসেনি।

ফররুখ আহমদ আমাদের জন্য অনেকগুলো মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ রেখে গেছেন। 'সাত সাগরের মাঝি', সিরাজাম মুনীরা', 'নৌফেল ও হাতেম', মুহূর্তের কবিতা', 'ধোলাই কাব্য', 'হাতেম তাঈ', 'হাবেদা মরুর কাহিনী', 'নতুন লেখা' ও 'দিলরুবা' এর অন্যতম। কবিতা সম্পর্কে যাদের এ্যালার্জি আছে তাদেরও ভালো লাগার মতো সবগুলো গ্রন্থ।

ফররুখ আহমদ ছিলেন আল্লামা ইকবালের পরম ভক্ত। ইকবালের কবিতা ফররুখের মত সার্থকভাবে আর কেউ অনুবাদে তুলে আনতে পারেনি। বলা যায়, তিনিই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে ইকবালকে পরিচিত করিয়েছেন।

ফররুখকে আমি ভালোবাসি। আমার জীবনে ফররুখের আগমনও ছিলো অতিশুভকর। শৈশবে ফররুখ এসেছিল লজেন্স নিয়ে। কৈশোরে এসেছিল পুরস্কার হয়ে। যৌবনে এসেছে বোধ আর শিক্ষা নিয়ে। তাই ফররুখের প্রতি আমি বরাবরই দুর্বল। ফররুখকে নিয়ে বেশ আছি। বোধ করি ওপারে তিনি আমার চাইতেও বহুগুণ ভালো আছেন।

আসিফ আসলাম
কুড়িল বিশ্বরোড, ঢাকা।